খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৬ ও রেশন বিদ্রোহ ২০০৭

দেবাংশু দাশগুপ্ত

নাগরিক মঞ্চ
কলকাতা

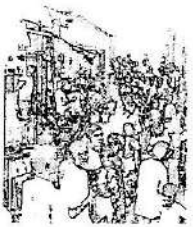

খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৬
ও
রেশন বিদ্রোহ ২০০৭

দেবাংশু দাশগুপ্ত

নাগরিক মঞ্চ
কলকাতা

Khadya Andolon 1966 O Ration Vidraha
by Debangshu Das Gupta

a Nagarik Mancha Publication
Price Rs. Thirty five only

প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৮

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষে নব দত্ত কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,
রুম নম্বর ৭, ব্লক বি (দোতলা), কলকাতা ৭০০ ০৮৫
ফোন ২৩৭৩ ১৯২১, ফ্যাক্স ২৩৭৩ ১৪৩৩
ই-মেল nagarikmancha@gmail.com
থেকে প্রকাশিত এবং
ক্যালকাটা গ্রাফিক্স, ৫৪, মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কলকাতা ৭০০ ০৫৪
থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

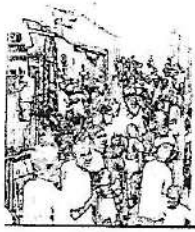

পূ র্বা ভা স

সংবাদ মাধ্যমের ভাষায় 'রেশন বিদ্রোহ'। বিদ্রোহ শুরু হয় বাঁকুড়ায়। ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৭। গম বিলি নিয়ে রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বাঁকুড়ার দুই ব্লক সোনামুখী ও বড়জোড়া। মাসের পর মাস এপিএল তালিকাভুক্তদের গম না দিয়ে রেশন ডিলারেরা তা খোলাবাজারে চড়া দামে বিক্রি করেছে, এই অভিযোগ নিয়ে সোনামুখীর রাধামোহনপুরের পঞ্চায়েত প্রধান সিপিআইএম-এর পবিত্র মন্ডলের কাছে দরবার করতে যান কড়িধ্যা, কুলাডাঙ্গা, মধ্যপাড়া, রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের কয়েকশো মানুষ। কিন্তু প্রতিকারের বদলে তাঁরা পান সিপিআইএম নেতা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে প্রহার ও অমানবিক লাঞ্ছনা। ক্ষিপ্ত জনতা এরপর ডিলারের বাড়ি ও দোকানে চড়াও হলে পুলিশ প্রথমে লাঠি, তারপর গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ছাত্র-সহ দু-জন বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। অন্যদিকে, একই অভিযোগে বড়জোড়ার কোটালপুকুর গ্রামে স্থানীয় রেশন ডিলার নারায়ণ দত্তের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হন কয়েকশো গ্রামবাসী। বাড়ি লক্ষ করে ইঁট-পাটকেল ছোড়া হয়। সিপিআইএম মদতপুষ্ট ওই ডিলার দুঃসহ স্পর্ধায় নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোনলা বন্দুক থেকে জনতাকে লক্ষ করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে জখম হন পাঁচজন। এরপর পুলিশ আসে। নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে জনতাকে রক্তাক্ত করে। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে জনতার দিকে গুলি ছোড়ার মতো ভয়ংকর অপরাধ করেও পার পেয়ে যায় দুর্নীতিগ্রস্ত ওই রেশন ডিলার! পুলিশ তাকে নিরাপত্তা দেয়।

পরের দিন অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সমগ্র ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যসচিবকে পাঠান। মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব খাদ্য দপ্তরকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলেন। সেই রিপোর্টে যথারীতি রেশন

ডিলার ও পুলিশের হয়ে সাফাই গেয়ে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতাকেই দায়ী করা হয়; এছাড়াও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বলেও উল্লেখ করা হয়। সিপিআইএমের সোনামুখী জোনাল কমিটির সম্পাদক শেখর ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, গ্রামবাসীরা নন, রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অছিলায় এলাকায় গণ্ডগোল পাকাতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন। একথায় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিন্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী ধরেই নেন যে, রেশন নিয়ে জনরোষ ব্যাপারটা এখানেই সমাপ্ত হলো। আর এরই ফাঁকে খোলামনে কিছু 'তদন্ত' সেরে ফেলার কাজে 'ব্রতী' হয় বাম সরকার। এবার রাজ্য খাদ্য দপ্তরের গুটি কয়েক আমলাকে বাঁকুড়ায় পাঠানো হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখে আমলাদের চক্ষু চড়কগাছ। দুর্নীতি, বেনিয়ম, ডিলারদের সঙ্গে খাদ্য দপ্তরের কর্মীদের এক বড়ো অংশের অশুভ আঁতাত, সর্বোপরি সিপিআইএমের স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সুচারু বোঝাপড়া। জেলার ওন্দা, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি ও শালতোড়া ব্লকের ১৩ জন রেশন ডিলারের সম্পর্কে বেশ কিছু সন্দেহজনক তথ্যও তাদের নজরে আসে। এরপর খাদ্য দপ্তরের আমলারা যাবতীয় তথ্য বাম সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু আমলাদের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছোবার আগেই ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় বীরভূমে। এপিএল গ্রাহকদের রেশনের গম পাচারের অভিযোগে বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় ডিলারদের ঘেরাও করা হয়। বীরভূমের সিউড়ি-২ ব্লকের পাড়ুই থানা এলাকায় বনশঙ্কা ও হরিপুর আর সাঁইথিয়া ব্লকের সরাভাসা ও রোঙ্গাইপুর গ্রামে খাদ্য দপ্তরের এক ইন্সপেক্টর সহ বেশ কয়েকজন রেশন ডিলারকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শিকারপুরের এক ডিলার কাজি আবু হোসেনের রেশন দোকান ও বাড়িতে ক্ষিপ্ত জনতা ভাঙচুর চালায় এবং শয়ে শয়ে গ্রামবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভেও অংশ নেন। ডিলারকে বাধ্য করা হয় প্রত্যেক গ্রাহককে ২৫০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে। গ্রামের মানুষ সেদিন প্রকাশ্যেই সিপিআইএম নেতাদের সঙ্গে ডিলার গোষ্ঠীর আঁতাতের অভিযোগ তোলেন। উল্লেখ্য, অশান্ত এলাকাগুলির মধ্যে একমাত্র রোঙ্গাইপুর ছাড়া বাকি সবকটি পঞ্চায়েতই সিপিআইএমের দখলে!

এরপর বীরভূমে জনরোষের আগুন বাড়তে থাকে। রেশন ডিলারের পাশাপাশি পুলিশ ও সিপিআইএম নেতারাও জনতার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পুলিশের মোটরবাইক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইঁটের ঘায়ে বীরভূম জেলা ডিএসপি-র গাড়ির কাঁচ ভাঙে। গোটা জেলা জুড়ে পথ অবরোধ শুরু হয়ে যায়। ১ অক্টোবর, ২০০৭ বীরভূম জেলা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। লাভপুরে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হন লাঙ্গলহাটা গ্রামের ৫৫ বছরের প্রৌঢ় আয়ুব শেখ। রেশন বিদ্রোহের প্রথম শহিদ।

এরপর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমানে। ৩ অক্টোবর, ২০০৭ বর্ধমানের কেতুগ্রাম

থানার গোন্নাসেরান্দি গ্রামের রেশন ডিলার বিপত্ত ারণ মণ্ডলের বাড়িতে গ্রামের শতাধিক মানুষ 'রফা' করতে এলে পুলিশ ও সিপিআইএম নেতারা ডিলারের পক্ষ নেওয়ায় গোলমাল বেধে যায়। পুলিশ লাঠি চালায়। জনতা ইঁট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। অবশেষে পুলিশের গুলি। প্রাণ হারান ৩৬ বছরের ক্ষেতমজুর ধানুপদ দাস। রেশন কাণ্ডের দ্বিতীয় শহিদ।

বর্ধমান থেকে পুরুলিয়া, তারপর মেদিনীপুর পশ্চিম, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি, মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়ে রেশন অসন্তোষ। লুটপাট, ডিলারের দোকানে ভাঙচুর, আগুন লাগানোর পাশাপাশি সিপিআইএম নেতাদের বাড়ি আক্রমণ। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কার্যত গণবিদ্রোহের চেহারা নেয়। বামফ্রন্টের শাসনে এমন বিদ্রোহ অভাবনীয়। খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজ্যের মানুষ দলবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দলীয় রাজনীতির হিসেব-নিকেশ দূরে সরিয়ে লোকসাধারণ নিজেরাই ব্রতী হয়েছেন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। ফিরিয়ে এনেছেন অতীত স্মৃতির প্রেক্ষাপট। ১৯৫৯ কিংবা ১৯৬৬-র 'খাদ্য আন্দোলন'। এবারের এই গণবিক্ষোভের সঙ্গে চার-পাঁচ দশক আগেকার উথাল-পাথাল পরিস্থিতির অবশ্য তফাৎ অনেক। সেদিন কংগ্রেস-বিরোধিতায় নেমেছিল বামপন্থীরা। রক্তক্ষয়ী সেই আন্দোলনের গৌরব পুরোপুরি আত্মসাৎ করতেও সক্ষম হয়েছিল তারা। আর তারই সুফল আজকের এই ক্ষমতার সনদ। কিন্তু এবার, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান সহ এ-রাজ্যের জেলায় জেলায় যা ঘটছে, তার বর্শামুখ খাদ্যের দাবি হলেও শেষ বিচারে তা হয়ে উঠেছে আগ্রাসী পার্টিতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ। সর্বগ্রাসী ক্ষমতার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত নাগরিক প্রতিবাদ। দলীয় ঝাণ্ডা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই তাই মানুষ জড়ো হয়ে গেছেন শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে, বিশেষ করে তিন দশকের বাম জমানায় এ-জিনিস নতুন।

২০০৪ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত প্রান্ত আমলাশোল গ্রামে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। ওই গ্রামের পাঁচজন মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিলেন। মরে গিয়েই যেন তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে একটাও মিছিল হয় নি, মিটিং হয় নি, বন্‌ধ হয় নি। প্রতিবাদ যতটুকু হয়েছিল, তা খবরের কাগজের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অতীতে যারা রাজ্য জুড়ে 'খাদ্য আন্দোলন' পরিচালনা করেছিল, তারাই আমলাশোলের অনাহারকে বিদ্রূপ করেছে। সংবাদমাধ্যমের 'বানানো গল্প' বলে উপেক্ষা করেছে। মানুষ চুপ থেকেছেন। কেন? মাত্র চার দশক আগের খাদ্য আন্দোলনের গৌরবময় স্মৃতি কী তাহলে আলোড়িত করতে পারে নি এ-রাজ্যের মানুষকে ? আসলে সকল আন্দোলন-বিক্ষোভের এক অনুসারী পর্যায় আছে। আমলাশোল কাণ্ডের আগে পশ্চিমবঙ্গের নিচ্ছিদ্র বাম জমানায় সেই অনুসারী পর্বটা কখনওই তেমনভাবে রচিত হয় নি। বিক্ষিপ্ত আন্দোলন অনেক হয়েছে। কখনও কংগ্রেস, কখনও তৃণমূল কংগ্রেস,

কখনও এসইউসি বা নকশালদের নেতৃত্বে ; তবে সে মূলত বাসভাড়া বৃদ্ধি, পুলিশি নিপীড়ন, সালিশি বিল ইত্যাদি গোছের প্রশ্নে। সে-আন্দোলনে দলীয় কর্মী-সমর্থক ছাড়া সাধারণভাবে জনসাধারণ হিসেবে যাদের ধরা হয়, তাদের যোগ দিতে দেখা যায় নি। ফলত, সে ছিল শুধু বিরোধীদের এক তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলন।

তবুও এবারের রেশন রোষের গতিপ্রকৃতি, তার দ্রুত বিস্তার বারে বারেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে উনষাট আর ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের পটভূমি। বামপন্থীদের নেতৃত্বে সেই আন্দোলনের আগে অনেক প্রস্তুতি ছিল। বিভিন্ন দলের সঙ্গে জোট বেঁধে সেদিনের কমিউনিস্টরা প্রচারে নেমেছিল। গণদরখাস্ত, ধর্না, রাজভবন অভিযান-পর্ব পার হয়ে সে-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল বহু দূর পর্যন্ত; রূপ নিয়েছিল এক ব্যাপক গণবিক্ষোভের। নির্দিষ্ট দল বা জোটের হাতে নেতৃত্বের কিংবা নিয়ন্ত্রণের রাশ থাকলেও এক সময় সে-আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততায় দ্রুত বেগে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। অতীত সেই স্মৃতি নিঃসন্দেহে এখনও গৌরবময়।

১৯৬৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সি সুব্রহ্মণ্যম সংসদে এক ভাষণ প্রসঙ্গে সারা দেশের তীব্র খাদ্য সংকটের কথা তুলে ধরেন। বলেন : ব্যাপক অনাবৃষ্টির ফলে এক কোটি টনেরও বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন কম হয়েছে। অতএব 'বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রিত বণ্টন ও খাদ্য ব্যবহারে সংযম অবলম্বনই' একমাত্র উপায়। খাদ্য পরিস্থিতি এমন গুরুতর আকার ধারণ করেছে যে, লক্ষাধিক লোকের বসতিপূর্ণ শহরগুলিতে রেশনিং প্রবর্তন ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমান (১৯৬৬) নিবিড় কৃষি-কর্মসূচি অনুযায়ী ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। সর্বোপরি তিনি চাষের পুরাতন পদ্ধতির স্থলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনের আহ্বান জানান।

খাদ্যমন্ত্রীর ভিক্ষাবৃত্তি

সংসদের বিরোধীপক্ষ (তখন বিরোধী দল বলতে, হিন্দু মহাসভা, সিপিআইএম, সিপিআই ইত্যাদি আর প্রত্যেকেই হীনবল) অভিযোগ তুললেন, সরকার এতদিন ৩০ লক্ষটন খাদ্যশস্যের ঘাটতির কথা শোনাচ্ছিল, এখন বলছে এক কোটি টনেরও বেশি। উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী সি সুব্রহ্মণম বললেন, শস্যের প্রাথমিক হিসাব থেকেই সর্বশেষ হিসাব সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও শস্যের হিসাব প্রস্তুতের পদ্ধতিরও উন্নতি হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে শস্যোৎপাদনের হিসাবে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন ধরা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে সেখানে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন ধরা হয়েছে। এই বিরাট পরিমাণ ঘাটতি পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণ গম ভারতে আমদানি করা হচ্ছিল।

এগিয়ে এল রাষ্ট্রসঙ্ঘ

ভারতের খাদ্য সংকট মোচনে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে এক আবেদনে রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ থান্ট এবং রাষ্ট্রসংঘ খাদ্য-কৃষি সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল ড. বি আর সেন বললেন : ভারতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুরু হয়েছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও দুর্গতি নিরোধে বিশ্বের জাতিসমূহ আর্ন্তজাতিক দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করবেন ও এই বিশাল মানবগোষ্ঠীকে আসন্ন চরম অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা তাদের সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করবেন। ভারতের

৭টি রাজ্য সাংঘাতিকভাবে বিপদের মুখে পড়েছে। তার মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষকে জরুরি সাহায্যদান অতি-আবশ্যক।

একটি পাদটীকা

এরকমই এক সার্বিক সংকটের মধ্যে দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী (লালবাহাদুর শাস্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যুর কারণে)। তাঁকে স্বাগত জানাতে মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি কে নায়েক ইন্দিরাকে সোনা দিয়ে মাপার কর্মসূচি হাতে নিলেন। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠার এক নিকৃষ্ট নমুনা।

পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে গুরুতর খাদ্য সংকট

১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গ্রামাঞ্চলে নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে চালবণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন শ্রেণির অবস্থা ক্রমে চরমে ওঠে। গ্রামের মানুষকে খোলাবাজার থেকে অধিকমূল্যে চাল কিনে জীবনধারণ করতে হচ্ছিল। গ্রামের মানুষ যে পরিমাণ রেশন পেয়ে থাকেন তা অনিয়মিত এবং প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। চালের দাম অগ্নিমূল্য। প্রতি কিলো এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা। নদিয়ার শান্তিপুরে খোলাবাজারে যদিও চাল মেলে তবে তা গরিব ও দিন-মজুরদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। একদিকে শহরাঞ্চলে নির্ধারিত ন্যায্যমূলের দোকান থেকে যে পদ্ধতিতে রেশন দেওয়া হয় সে-ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নয়। অনেকে ঠিক মতো চাল পান না। ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির সামনে দীর্ঘ লাইন। অন্যদিকে লেভি ব্যবস্থা চালু ও তার নোটিশ জারি শুরু হওয়ায় মানুষের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ফুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে লেভি আদায়ের জন্য যে পরিমাণ ধান নির্ধারিত হয়েছে তার পরিমাণ ৬ হাজার টন। ইতিমধ্যে (জানুয়ারি, ১৯৬৬) আদায় হয়েছে মোট সাতশো টন। স্থানীয় ব্লক অফিস থেকে জানা গেছে, এখানকার গ্রামাঞ্চলের চাষিরা যদি নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে সুবিধা দরে চাল পেতেন তাহলে তারা স্বেচ্ছায় তাদের জমির ধান লেভি দিতেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সেই রেশন সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়ায় মানুষের দুঃখ সীমাহীন হয়ে উঠেছে এবং লোক খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

লালগোলায় অনাহার

চালের দুর্মূল্যতার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অর্ধাহার, অনাহার দেখা দিয়েছে। অনেকে চাল জোগাড় করতে না পেরে শুধু বেগুন সেদ্ধ করে খেয়ে উদর পূরণ করছেন। কেউ কেউ ৫০০ গ্রাম চাল ও ৩-৪ কেজি বেগুন মিশিয়ে সেদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এখানে অবশ্য খোলাবাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু চালের দর চাল ব্যবসায়ীদের মর্জির ওপর। সকালে চালের দর এক টাকা পঁচিশ পয়সা কেজি দুপুর গড়ালেই তা এক টাকা ষাট পয়সা কেজি। তাও পাওয়া যাচ্ছে না। এ-ব্যাপারে কিছু বললেই চাল ব্যবসায়ীর জবাব, 'চাল আমদানি নেই।' লালগোলা সদরে রেশন দোকানে প্রতি ইউনিটে ৫০০ গ্রাম চাল (তাও ধান সমতে) ও ৫০০ গ্রাম গম দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ণ রেশনিং-এর দাবিতে জনসভা

ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে 'কমিউনিস্ট পার্টির' আহ্বানে দিকে দিকে জনসভা শুরু হয়েছে। জনসভাগুলিতে সরকারের খাদ্যনীতি, লেভি ও কার্ডনিং-এর তীব্র সমালোচনা করা হয়। দাবি করা হয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে ও স্থানীয় চাষি ও ক্ষেত-মজুরদের সরকার থেকে দীর্ঘমেয়াদি স্বল্প সুদে ঋণ দিতে হবে।

বর্ধমানে সমবায় সমিতিগুলি বিপন্ন

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে রায়না ও খণ্ডঘোষ থানা থেকে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৫৫ হাজার মেট্রিক টন ধান সরবরাহ করার সরকারি পরিকল্পনা করা হয়। তার মধ্যে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ও ওই এলাকার ১৬টি মিল ও সরকার নিয়োজিত ডি পি এজেন্টদের মাধ্যমে মাত্র ৫ হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারি তরফে বহু আশ্বাস ও সমবায় সমিতিগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিল মালিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে সমবায় সমিতিগুলিকে ধান সংগ্রহে নামানো হয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই চাষিরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কে প্রকৃত সরকারি এজেন্ট? সমবায় সমিতি, নাকি মিল মালিকেরা? কার দর ঠিক? এই নিয়ে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের সমবায় সমিতি-গুলিকে বর্ধমান জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো সমিতির সঙ্গে তুলনা করা হতো। সে সময়টা (জানুয়ারি, ১৯৬৬) ছিল পৌষ পার্বণের সময়। তখন মুনিষ বিদায়, ধান ঝাড়া ও ধান বেচার তাগিদ। কিন্তু তখনই হঠাৎ রাজ্য সরকার সমবায় সমিতিগুলিকে ধান কেনার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। টাকার অভাবে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে সমবায় সমিতির মারফত খাদ্য সংগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। চাষিরা দলে দলে গোরু গাড়ি-যোগে সমবায় সমিতির কেন্দ্রে ধান বেচতে এসে ফিরে যান। ইতিমধ্যে মিল মালিকেরা চাষির কাছ থেকে চোদ্দো থেকে সাড়ে-চোদ্দো টাকা মণ হিসাবে ও দুই কেজি *ঢলতা* দিয়ে ধান কিনতে শুরু করেন। সমবায় সমিতিগুলি টাকা দিতে না পারার জন্য চাষিরা মাথায় হাত দিয়ে বসেন। সেই সময় একটি হিসাবে জানা যায় যে, খাদ্য

দপ্তরে সমবায় সমিতিগুলির প্রায় ১২ লক্ষ টাকার মতো বিল জমা হয়েছে। খাদ্য দপ্তর থেকে বিল পেয়ে সমবায় ব্যাংক টাকা দিতে অপারগ হয়। এই পরিস্থিতির জন্য জেলা খাদ্য দপ্তরের অসহযোগিতা ও অনমনীয় মনোভাবই দায়ী বলে সমবায় সমিতিগুলি অভিযোগ তোলে।

খাদ্যের অভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা

১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারির *দৈনিক বসুমতী* পত্রিকায় ছাপা হয় : '... বেশ কিছুদিন হইতে এখানে এক পরিবারে নিদারুণ খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে। যাহা উপার্জন হয়, তাহাতে সংসারের সব খরচ কুলায় না। চাল, আটা, তেল ক্রয় করিতেই প্রায় সমুদয় মাহিনার টাকা খরচ হইয়া যায়। সংসারের দৈনন্দিন চাহিদার ফলে অশান্তিরও সৃষ্টি হয়। অবশেষে খাদ্যের অভাবে অনশনক্লিষ্ট কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিসের জনৈক শিক্ষিত কর্মচারী দুঃসহ জীবনের চির অবসান ঘটাইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিলে উক্ত অফিসেরই সহকর্মী বন্ধু দেখিতে পাইয়া শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে বাঁচাইতে সক্ষম হন। কয়েক সেকেন্ড বা কয়েকটি মুহূর্ত বিলম্ব হইলে মূল্যবান জীবনটি চিরতরে নষ্ট হইত ও একটি সংসার ভাসিয়া যাইত।'

কৃষ্ণনগরের বাজারে তখন চালের অগ্নিমূল্য। ১ টাকা ৬০ পয়সা থেকে ১ টাকা ৭০ পয়সা কেজি দরে চাল বিক্রি হচ্ছিল। পুলিশি হামলা হলে ওই দর আরও বেড়ে ১ টাকা ৯০ পয়সা ও ২ টাকা কেজি-তে পরিণত হয়। কৃষ্ণনগর শহরে তখন কেরোসিন তেলেরও নিদারুণ অভাব চলছে। যতটুকু পাওয়া যাচ্ছিল তা দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছিল। সেই সময় হিন্দু মহাসভার নেতারা অভিযোগ করেন যে, প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন তেল পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে বীরনগর বাজার ও হাটে চালের নিদারুণ আকাল দেখা দেয়। চালের জন্য সাধারণ মধ্যবিত্তের অবস্থা চরমে পৌঁছোয়। কালোবাজারে যেটুক গোপনে বিক্রি হচ্ছিল তার দর ছিল ১ টাকা ৮৫ পয়সা থেকে ১ টাকা ৯০ পয়সা কেজি। তার ওপর বাজারে ও হাটে পুলিশ হানা দিয়ে কিছু চাল হস্তগত করে। ফলে কালোবাজারেও চাল উধাও হয়ে যায়। রেশনে চালের পরিমাণ কমিয়ে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের মধ্যে হাহাকার রব উঠে যায়।

প্রকাশ্যে ৩০ টাকার উর্ধ্বে ধান বিক্রি

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তখন কিছু ব্যবসায়ী প্রকাশ্যে ৩০ টাকার বেশি দামে ধান কিনে গোপন স্থানে মজুত করে রাখছিল। সাধারণ গরিব চাষি নগদমূল্যে সরকারি দর অপেক্ষা বেশি দর পাওয়ায় সরকারের কাছে তারা ধান বিক্রি করছিল না। রাতের অন্ধকারে পুলিশের সামনে প্রচুর চাল পাচার হচ্ছিল বলে অভিযোগ

উঠেছিল। সমগ্র জেলার কর্ডন এলাকায় পুলিশের অত্যাচার বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল।

পুলিশি অত্যাচারের একটি নমুনা

ধান-চাল ধরার নামে পুলিশ নিরীহ জনসাধারণের ওপর যে কীরকম নির্দয় আচরণ করত তার একটি মর্মান্তিক সংবাদ সেই সময়ের কাগজপত্রে ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার গোপালপুর গ্রামে। ওই গ্রামের এক বয়স্কা মহিলা একটি অল্পবয়সী মেয়ে-সহ জিয়াগঞ্জ স্টেশন থেকে ৩৬১ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ওঠে। তাদের সঙ্গে তিন-চার কেজি ধান ছিল। ট্রেনটি ভগবানগোলা স্টেশন ছাড়ার পরে জনৈক পুলিশ কনস্টেবল ওই কামরায় উঠে মহিলাকে পাকড়াও করে। 'বে-আইনিভাবে' ধান পাচারের অভিযোগ এনে মহিলাকে ভয় দেখায় ও ঘুষ চায়। মহিলার কাছে টাকাপয়সা না-থাকায় ঘুষ দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখন পুলিশকর্মীটি উগ্রমূর্তি ধারণ করে ও ধানের পুঁটলিটি ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গের মেয়েটি পুঁটলিটি বুকে আঁকড়ে ধরে। কারণ এটি ছিল তাদের ক্ষুধার অন্ন। কিন্তু পুলিশকর্মীটি নির্দয় পশুর মতো ছোটো মেয়েটির বুক থেকে চালের পুটলিটি এমনভাবে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে যে, পুঁটলি-সহ বাচ্চা মেয়েটি চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যায় ও তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটে। বেগতিক দেখে পুলিশটি অবশ্য পালিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, ওই কামরায় বৃদ্ধা ও মেয়েটি ছাড়া অন্য কোনো যাত্রী ছিলেন না।

পুলিশ সেজে অত্যাচার মুর্শিদাবাদে

২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৬ বারো-চোদ্দো জন মহিলা সাগরদীঘি থানা অঞ্চল থেকে সামান্য কয়েক কেজি চাল নিয়ে ভগবানগোলা বাজারে বিক্রি করার জন্য আসছিলেন। তখন বেলিয়া শ্যামপুর গ্রামের কয়েকজন লোক নিজেদের থানার বড়বাবু, মেজবাবু প্রভৃতি পরিচয় দিয়ে ভগবানগোলা থানার মহৎপুর গ্রামের কাছে ওই মহিলাদের আটক করে। মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করলে পুলিশ পরিচয়ধারী লোকগুলি টাকা ও চাল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে; তার ওপর আবার মারধোরও করে। গণ্ডগোলের মধ্যে কয়েকজন মহিলা প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে পালিয়ে যান ও ভগবানগোলা থানায় খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে আসল পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ও নকল পুলিশদের গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে ঘুষের টাকা ও চাল উদ্ধার করে, কিন্তু তা আক্রান্ত মহিলাদের হাতে তুলে না দিয়ে থানায় নিয়ে যায়। মহিলারা সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

ঘাটাল মহকুমায় লেভির দৌরাত্ম্য

মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় লেভি আইন মারফৎ ধান সংগ্রহ করতে গিয়ে মাননীয়

মহকুমা শাসক সাধারণ চাষি ও মধ্যবিত্তদের যে নিদারুণ ও মর্মান্তিক সংকটে ফেলেছিলেন তা অবর্ণনীয়। একেবারে আচমকাই মহকুমা শাসক মহোদয় বহুসংখ্যক চাষির ওপর লেভির নোটিশও জারি করেন এবং লেভি নির্ধারিত ধান তাঁর নোটিশে উল্লেখিত দোকানে বিক্রি করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই লেভি নির্ধারণ একান্তভাবে অন্যায় ও অসঙ্গত বলে কৃষক মহলে দাবি ওঠে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ওই পরিমাণ ধান তাদের চাষই হয় না। তার ওপর চন্দ্রকোনা থানার বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে ধান কেড়ে নেওয়া শুরু হয়। গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, অনেক চাষির ওপর যে লেভির নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা এত ধান কোথা থেকে দেবেন? পোষ্যদের অনাহারে রেখে দেবেন? যে-জমি হস্তান্তর বা বিক্রি হয়ে গেছে তার ধান কোথা থেকে পাওয়া যাবে? উৎপাদকের কী কোনো অধিকার নেই নিজের উৎপাদনে?

বনগ্রাম মহকুমায় চালের মূল্যের উর্ধ্বগতি

১৯৬৬-র জানুয়ারির শেষে চব্বিশ পরগণার (তৎকালীন অখণ্ড) বনগ্রাম (বনগাঁ) মহকুমার সর্বত্র চালের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। প্রতি সপ্তাহে গড়ে কুড়ি থেকে চল্লিশ পয়সা করে দাম বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ওই বছরে বিভিন্ন প্রকারের সবজি উৎপাদন বেশি হওয়ায় নিম্নবেতনভুক মানুষেরা বেশি পরিমাণে তা কিনেছিলেন। কিন্তু এ-অবস্থা বেশি দিন চলে নি। কারণ ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই সরকারি আমদানি কমে যায়। মানুষের দুর্গতি চরমে ওঠে। তখন বনগ্রাম বাজারে চালের কেজি ১ টাকা ৮৫ পয়সা থেকে ২ টাকার মধ্যে চলছিল। প্রতিদিনই প্রায় দাম বাড়ছিল। ধানের মণ ৬৫ টাকা। বাগদায় চাল ১ টাকা ৮৫ পয়সা কেজি ও ধান ৬৫ টাকা মণ। গোপালনগর, চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, পাল্লা সহ সর্বত্র একই ছবি। ওদিকে বনগ্রাম পৌর এলাকায় রেশনে ৭৫০ গ্রাম চাল ও ৫০০ গ্রাম আটা বা গম দেওয়া হচ্ছিল। চাল ছিল দুর্গন্ধযুক্ত, কাঁকরে পূর্ণ।

তারকেশ্বরে হাজার হাজার চাষি পরিবার বিপর্যস্ত

১৯৬৫ সালে অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন কম হওয়ায় চাষির ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। তাই ১৯৬৬ সালের শুরুতে দেখা গেল যে, তারকেশ্বরের অধিকাংশ চাষিই খাদ্যাভাবে বিপর্যস্ত। ভাগচাষিদের ওপর জোতদারের অত্যাচার ও বঞ্চনা ক্রমবর্ধমান। ভূমিহীন কৃষকদের অর্ধাহারে দিন কাটছে। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা লেভি ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বোঝাচ্ছিলেন। লেভির মাধ্যমে ধান সংগ্রহও চলছিল স্থানীয় থানা সমবায় বিপণন সমিতির মাধ্যমে। অন্যদিকে তারকেশ্বর তরকারি বাজারে চালের খুচরো বাজার বসত। কিন্তু মাঝে মাঝে পুলিশি হামলায় বাজারের ব্যবসায়ীরা

চাল কেনাবেচা বন্ধ করে দিতেন। ফলে স্থানীয় মানুষের প্রায়ই ভাত জুটত না। কিন্তু ওই একই সময় লোকনাথ, বাহিরখণ্ড, কৈকালা ইত্যাদি স্টেশনে বিপুল পরিমাণ চাল ট্রেনে পাচার হচ্ছিল। এ-ব্যাপারে পুলিশ আশ্চর্যজনকভাবে নির্বিকার ছিল। মানুষ অভিযোগ তুলেছিলেন যে, পুলিশ নিজেই এই পাচার-চক্রের সঙ্গে জড়িত।

পোলবা থানায় ব্যাপক খাদ্যসংকট

হুগলি জেলার পোলবা এমনিতেই স্থায়ী খাদ্যঘাটতি এলাকা ছিল। তার ওপর ১৯৬৬ সালে অতিবৃষ্টি ও ডিভিসি-র জলনিকাশির অভাবে প্লাবনে ব্যাপক শস্যহানি ঘটে। সামান্য যেটুকু ফসল হয়েছিল তা খোরাকি বাবদ ভাঙাবার সমস্ত পথ সরকারিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথমে পোলবা থানার পুলিশ মৌখিকভাবে সমস্ত হাস্কিং মিল চালু করার অনুমতি দেয়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই হুগলির জেলাশাসকের আদেশে সে দুটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ওই অঞ্চলের চাষিদের কাছে সামান্য ধান মজুত থাকলেও তা ভাঙানো বন্ধ হওয়ায় চাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। চাষিদের জীবনে নেমে আসে অর্ধাহার, অনাহার। এলাকায় চালের এই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্য চোরা-বাজারের রাজত্ব কায়েম হয়। ন্যায্যমূল্যে চাল পাওয়ার সরকারি ব্যবস্থা নেই। আংশিক রেশনে শুধুমাত্র ভূমিহীনদের মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম চাল দেওয়া হচ্ছিল। গম সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ। বিকল্প ব্যবস্থা না করে স্থানীয় ব্যবস্থা ধ্বংস করে ওই খাদ্যসংকট সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ভিজা চাল রেশনে

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ *দৈনিক বসুমতী*তে ছাপা হয় '... বর্তমান সপ্তাহের রেশনের চাউল যাহা দেওয়া হয় তাহা একেবারে ভিজা। তাহার উপর চাউল আঁকাড়ি। এ সংবাদ পাইয়া থানায় কর্তৃপক্ষের নিকট, এই চাউল জনসাধারণকে না দিয়া ভালো চাউল আনাইয়া দেওয়া হউক এবং যে ব্যবসায়ী এই অপকর্ম করিয়াছে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। স্থানীয় বিডিও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পুলিশ নিয়মমাফিক কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, কন্ট্রোলার বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায় না এবং ভিজা চাউলই জনসাধারণকে লইতে বাধ্য করা হইতেছে...।'

দৈনিক বসুমতী-র আর একটি রিপোর্ট

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬, *দৈনিক বসুমতী*-র সংবাদ শিরোনাম 'বুভুক্ষ মানুষের অন্ন লইয়া খেলা'। সোনারপুর, ২৪ পরগণার ঘটনা। 'সোনারপুর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে আংশিক রেশনিংয়ে খাদ্যশস্য সরবরাহে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। প্রকাশ, গত ৩

ফেব্রুয়ারি তারিখে সোনারপুর ব্লক ফুড ইন্সপেক্টর কর্তৃক কামরারবাদ অঞ্চলের একজন ডিলারের নামে ১৫ কুইন্টাল ২৫ কেজি চাউল এবং ২৫ কুইন্টাল গমের পারমিট এবং সোনারপুর অঞ্চলের আর একজন ডিলারের নামে ১০ কুইন্টাল চাউল এবং ১৮ কুইন্টাল গমের পারমিট ইস্যু করা হয়। সরকারি লাইসেন্স-প্রাপ্ত একজন পাইকারি ব্যবসায়ী গত ৬ ফেব্রুয়ারি উভয়ের নিকট হইতে পুরা দামও নাকি গ্রহণ করেন। রাজপুর পৌরসভা এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে চাউল ও গম সরবরাহ শেষ হইলে পুরা একটি দিন চাউল ও গমের আশায় বসিয়া থাকার পর উক্ত ডিলারদ্বয়কে পাইকারি ব্যবসায়ী সংস্থার পক্ষ হইতে নাকি জানানো হয় যে, গম দেওয়া যাইবে না, কারণ স্টক নাই। কালিকাপুর অঞ্চলকে অনুরূপভাবে কিছুই দেওয়া যাইবে না বলিয়া জানানো হয়। ইহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের ডিলারদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

'বুভুক্ষ মানুষের অন্ন লইয়া এখানে যে ধাপ্পাবাজি চলিতেছে এবং দুরভিসন্ধিমূলকভাবে জনজীবনে যে বিপর্যয় ডাকিয়া আনা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদে সোনারপুর থানা খাদ্য কমিটি আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি এক জনসভা আহ্বান করিয়াছেন। আংশিক রেশনিংয়ে জনজীবনে যে কোনো নিশ্চয়তা নাই, তাহা জনসাধারণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন এবং সোনারপুর থানায় বিধিবদ্ধ পুরা রেশনিংয়ের দাবিতে সোনারপুর থানা খাদ্য কমিটির ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়াছে।'

আন্দোলনের সূচনা : পথ দেখাল কেরল

খাদ্যসংকটে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল, বিশেষ করে সদ্য বিভক্ত দুই কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই ও সিপিআইএম) নেতারা যখন জনসভা, ডেপুটেশন ইত্যাদির মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তখন কেরলে রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। দুই কমিউনিস্ট পার্টি তো বটেই, এসএসপি, আরএসপি, পিএসসি, এমনকী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা বড়ো একটি অংশ মিলিতভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও জঙ্গি বিক্ষোভে সামিল হয়। প্রবল আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার কেরলে রেশনে চাল মাথাপিছু ১২০ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ১৪০ গ্রাম করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য এই সামান্য অন্ন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে আন্দোলনকারীরা নিরস্ত্র হওয়া তো দূরের কথা, আন্দোলনকে আরও ব্যাপকতর করে তোলেন। ২৮ জানুয়ারি, ১৯৬৬ পালিত হয় কেরল বন্‌ধ। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এবার হাত মেলায় কেরলের ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী সমিতি ও ছাত্র ইউনিয়নগুলি। স্বতঃস্ফূর্ত সেই বন্‌ধে কেরলের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। সে সময়ের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা হয়, 'সরকারি খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের এ হেন সম্মিলিত, ঐক্যবদ্ধ অথচ সুশৃংখল প্রতিবাদ 'স্বাধীনতা উত্তর' ভারতে সত্যিই অভূতপূর্ব। এমন সর্বাত্মক বন্‌ধ সচরাচর দেখা যায় না ...।'

তবে দু-এক জায়গায় অবশ্য বন্‌ধ হিংসাত্মক চেহারা নিয়েছিল। কেরলের অন্যতম বৃহৎ জেলা কান্নানোরে প্রায় ১০ হাজার মানুষ একটি মালগাড়ি আক্রমণ করে চাল-গম লুণ্ঠন করেন। তারপর তা স্থানীয় মানুষের মধ্যে সমান ভাগে বিলিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ গুলি চালায়। ১০ জন আহত হন। গুলি চালানোর প্রতিবাদে ওইদিন (২৮ জানুয়ারি, ১৯৬৬) সন্ধ্যার দিকে বালিয়াপট্টনমে কয়েক হাজার জনতা পুলিশ বাহিনীকে ঘেরাও করে। পুলিশ দু-রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হন তিন কলেজ ছাত্র ও একজন সরকারি কর্মচারী। ওই ঘটনায় আগুনে ঘি পড়ার মতো জনবিক্ষোভ আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সে-সময় কেরলের তৎকালীন রাজ্যপাল এ পি জৈন সস্ত্রীক খোলা জিপে চড়ে ত্রিবান্দ্রমের প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমা করে বিক্ষোভকারীদের শান্ত হওয়ার আবেদন জানান। বিভিন্ন স্থানে গাড়ি থামিয়ে রাজ্যপাল জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। জনতাকে 'শান্তিপূর্ণভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে' বন্‌ধ পালনের আবেদন করেন। রাজ্যপালের আবেদনে কাজ হয়। বিশেষ করে রাজ্যপালের রেশনে চালের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার আশ্বাস জনতার মনে দাগ কাটে। এরপর বন্‌ধের বাকি সময়টা বেশ শান্তিতেই কেটে যায়।

কেরলে খাদ্য আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও টনক নড়ে। নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়ে এক জাতি, এক প্রাণ, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদির মতো আবেগঘন কথাবার্তা, কেরলে খাদ্যের দাবিতে সর্বাত্মক আন্দোলনের চেহারা দেখে ঘুলিয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে বললেন, দেশের খাদ্য পরিস্থিতির প্রতিই সরকার আগে নজর দেবে, পরে অন্য প্রশ্ন। '... এই দুর্বৎসরে জনগণকে সুনিশ্চিতভাবে খাদ্য সরবরাহ করাই হবে তাঁর সরকারের প্রথম কাজ। দেশে অবশ্য আরও অনেক সমস্যা আছে যেদিকে তাঁদের জরুরি নজর দেওয়া উচিত, কিন্তু খাদ্যের প্রশ্নটি সর্বাগ্রে বিবেচ্য, কারণ এই ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেওয়া চলবে না ...।'

কেরল বন্‌ধের দিনই (২৮ জানুয়ারি, ১৯৬৬) ইন্দিরা গান্ধীর টেলিফোন পেয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে কেরলে পাঁচ হাজার টন চাল পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। একইভাবে ওড়িশা থেকেও জরুরি ভিত্তিতে কয়েকহাজার টন চাল পাঠানো হয়।

এদিকে কেরলের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয় এক অভিনব আন্দোলন। 'কেরলের জন্য চাল বাঁচাও' শীর্ষক ওই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন সোস্যালিস্ট পার্টির সাংসদ ইন্দ্রকুমার গুজরাল (১৯৯৬-৯৭ সালে ইনি খুবই স্বল্প সময়ের জন্যে ক্ষণজীবী যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন)। আন্দোলন চালানোর জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কমিটির আহ্বান ছিল, কেরলের বুভুক্ষু মানুষের জন্য দিল্লির নাগরিকরা প্রতিদিন কিছু পরিমাণে চাল দান করবেন। এছাড়াও তাঁরা কেরলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভাত খাবেন না কিংবা বিয়ে ইত্যাদি উপলক্ষে প্রীতিভোজের আয়োজন করলে সেখানে খাদ্য

তালিকায় ভাত রাখবেন না।

শুরুতে এই আন্দোলনে বেশ ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগামী কয়েকটি সংগঠনের বাধায় ও ইন্দ্রকুমার গুজরালকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ায় 'কেরলের জন্য চাল বাঁচাও' আন্দোলন থিতিয়ে যায়। তবে শ্রীগুজরাল ও তাঁর সহযোগীদের সৎ ও সাহসী প্রয়াসকে কেরলের মানুষ আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল কেরল

৩১ জানুয়ারি (১৯৬৬) পিটিআই, ইউএনআই সূত্রে প্রাপ্ত খবর : কেরলে আবার আগুন জ্বলছে। রেশনে চালের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী মারমুখী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে ত্রিবান্দ্রমে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে, লাঠি চালায় কোট্টায়ামে। দু-জায়গাতেই মারমুখী ছাত্রেরা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছোড়ে। দু-পক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ও পুলিশ আহত হন।

ওদিকে কুইলনের কাছে আঞ্জালিমুদ এলাকায় একদল ছাত্র একটি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণের চেষ্টা চালায়। তবে দ্রুত পুলিশি হস্তক্ষেপে তা ব্যর্থ হয়। ত্রিবান্দ্রম ও কুইলনের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিবান্দ্রমে বিক্ষোভকারীরা একটি বাস ও ত্রিচুরে একটি মুক্ত অঙ্গন থিয়েটার জ্বালিয়ে দেয়। কমপক্ষে ১৫টি বাস ইট বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সারা রাজ্যে প্রায় শতাধিক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় নাম্বুদ্রিপাদ সহ অসংখ্য বিরোধী নেতা ও কর্মীকে।

পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর : পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ

কেরলের ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়েই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন সভা-সমিতি-সেমিনার-ডেপুটেশনের বেড়াজাল ছিন্ন করে জঙ্গি রূপ পেতে শুরু করে ফেব্রুয়ারির (১৯৬৬) মাঝামাঝি থেকে।

১৬ ফেব্রুয়ারি বিষ্ণুপুর থানার ভোলাখালি হাটে বিক্রির জন্য আনা চাল আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাটের জনতার সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। লাঠি চালায়। ঘটনাস্থল থেকে ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের একটি গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে হাটের কাছে এক পুকুরে ফেলে দেয়। বিষ্ণুপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বলে ওঠা এই স্ফুলিঙ্গ ক্রমেই দাবানল হয়ে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

বসিরহাটে বিক্ষুব্ধ ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি

ধকপাকড়, হয়রানি, মারপিট ইত্যাদি পর্ব অতিক্রম করে গুলি চালানো শুরু হয়ে গেল। খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। ন্যায্যমূল্যে রেশন ও কেরোসিন তেলের দাবিতে বিক্ষুব্ধ বিরাট এক ছাত্র মিছিলের ওপর প্রথমে লাঠি ও তারপর ৩০ রাউন্ড গুলি চলে। আহত হন ১০ জন ছাত্র। এর মধ্যে চারজন (পরিতোষ মণ্ডল, অনন্ত দালাল, শ্যামা ঘোষ ও মলয় সরদার) গুরুতর আহত হন এবং তাদের কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনজন ছাত্রীসহ গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় ১০০ জনকে। ওইদিনের গুলি চালানোর ঘটনায় বসিরহাট-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। বার অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, এমনকী ব্যক্তিগতভাবে বহু পরিচিত কংগ্রেসী মানুষও ১৭ ফেব্রুয়ারি বসিরহাট বনধের ডাক দিলেন। অন্যদিকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন কলকাতায় বসে শোনালেন, ছাত্র নামধারী একদল গুণ্ডা মারমুখী হয়ে উঠেছিল, পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। এই সেই কণ্ঠস্বর, যা হুবহু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আজকের বামপন্থী শাসকদের কণ্ঠেও।

স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ স্বরূপনগর থানার তেঁতুলিয়া আর মালাঙ্গাপাড়ার বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করার পর মিছিল করে বিডিও অফিস ঘেরাও করে। রেশনে চালের পরিমাণ বৃদ্ধি ও কেরোসিন তেলের সংকটের নিরসনের দাবিতে তারা শ্লোগান দিতে থাকে। বিডিও অফিসের কর্মচারীরা দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন। ছাত্ররা কিছুক্ষণ শ্লোগান দেওয়ার পরে মিছিলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। স্বরূপনগর থানার সামনে দিয়ে মিছিল চলতে থাকে। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ওই মিছিলের ওপর থানার বারান্দা ও ছাদ থেকে পুলিশ আচমকা গুলি চালাতে শুরু করে। আট রাউন্ড গুলি চলে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। গুলিতে নিহত হয় তেঁতুলিয়া স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র নুরুল ইসলাম। গুরুতর আহত হয় পঞ্চম শ্রেণীর কিশোর মণীন্দ্র বিশ্বাস আর দশম শ্রেণীর কার্তিক।

বসিরহাট, স্বরূপনগরের ঘটনার কয়েকদিন আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম লোকসভায় বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেছিলেন : 'কলকাতায় বিধিবদ্ধ রেশনিংয়ের সাফল্যের জন্য পশ্চিমবাংলার পেশাদার আন্দোলনকারীরা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে।' এই মন্তব্যে লোকসভার কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে তুমুল হাসির রোল পড়ে যায়। এই সাংসদরা তখন জানতেন না যে, তাঁদের অলক্ষ্যে আর একটি বৃহৎ বিদ্রূপ অপেক্ষা করছিল যা বড়ই মর্মান্তিক। অর্থাৎ ওই দিনের পরেই খাদ্য ও কেরোসিনের

দাবিতে বসিরহাট, স্বরূপনগরে ছাত্র ও জনতার যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ফেটে পড়ে, তাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য বর্ষিত হয় পুলিশের লাঠি-গুলি। আর সেদিনের বিক্ষোভকারী ছাত্র-যুব ও হাজার হাজার মানুষ 'পেশাদার আন্দোলনকারী' ছিলেন না; বরং তারা ছিলেন পশ্চিমবাংলার ক্ষুধার্ত জনসমাজের একটি অংশ। প্রকৃত পেশাদার আন্দোলনকারীরা বোধ হয় তখন এর থেকে অনেক দূরে।

আবার গুলি : এবার বাদুড়িয়ায়

ক্ষুধার অন্ন চাইতে গিয়ে আবার গুলি খেলেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তারিখটা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬। কয়েক সপ্তাহ ধরে রেশনে আর খোলা বাজারে কোথাও চাল না পেয়ে কয়েক হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ বাদুড়িয়া থানা ঘেরাও করেন। তখন থানার অফিসার নাকি আশ্বাস দেন যে, ২০ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) থানায় সিজ করা চাল ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করবেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ছিল সাপ্তাহিক হাটবার। কিন্তু বসিরহাট ও স্বরূপনগরে গুলি চালাবার প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে বাদুড়িয়ায় হরতাল চলছিল। তাই হাট বসে নি। তবুও আগের দিনে পুলিশকর্তার আশ্বাসে বিশ্বাস রেখে বিকেলের দিকে হাটের মাঠে ভিড় জমতে থাকে। ক্রমে ভিড় বাড়তে বাড়তে বিপুল আকার ধারণ করে। কিন্তু আশ্বাস মতো পুলিশ চাল নিয়ে আসে নি। মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়েন। তারা থানার দিকে এগোতে থাকেন। পুলিশ কোনোরকম সতর্কীকরণ ছাড়াই প্রথমে লাঠি, তারপর ওই বিশাল জনতার ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করেন। ৫৮ রাউন্ড গুলি চলে। ঘটনাস্থলেই নিহত হন বসিরহাট কলেজের ছাত্র আবদুল হামিদ আর স্থানীয় একটি স্কুলের ছাত্র দারবক্স মণ্ডল। গুলি ও আতঙ্কের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে অসংখ্য মানুষ আহত হন। অনেকে নিখোঁজ হয়ে যান। বাদুড়িয়া এলাকা থেকে গুলিতে আহত যে সাতজনকে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তাঁরা হলেন, হরিদাস বিশ্বাস, বিপ্রদাস হালদার, গোপাল মণ্ডল, নিমাই কর্মকার, তুলসী গোলদার, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ও মধুসূদন মণ্ডল।

অশান্তি ক্ষোভ আর বেদনার ছায়া

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ কলকাতার অধিকাংশ বড়ো বড়ো সংবাদপত্রে 'রক্তস্নাত' পশ্চিমবঙ্গের যে ছবি ও প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল, তাতে ফুটে উঠেছিল বসিরহাট, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগরের লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বেল-উত্তাল-ক্রুদ্ধ কিন্তু শান্ত এক শোকের প্রতিচ্ছবি। তৎকালীন সাংবাদিকদের মরমী কলমে সেই ছবি ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল। তাঁরা দেখেছিলেন, বিক্ষোভে-বেদনায় ওইসব অঞ্চল যেন এক অগ্নিগর্ভ রূপ ধারণ করেছে। ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে মিলেছে সর্বাঙ্গীণ সর্বব্যাপক এক মহতী ঐক্য। সেখানে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সব একাকার হয়ে

গেছে। দাবি তাঁদের এক, সংগ্রাম তাঁদের অবিভাজ্য। তাই সেদিন এই বঙ্গের শহরে-বন্দরে-গ্রামে সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল কালো পতাকা আর কালো ব্যাজ। শোকের চিহ্ন সকলের গায়ে, সবার ঘরে। কিন্তু কেউ মূর্চ্ছাহত হয়ে বসে নেই। রাস্তায় রাস্তায় তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বসিরহাটে ১৪৪ ধারা ও কার্ফু জারি ছিল। কিন্তু কে তার পরোয়া করে? সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রশস্ত রাজপথের দু-পাশে হাজির হাজার হাজার মানুষ।

ওদিকে বসিরহাট শহরে দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে গঠিত হয়েছে শক্তিশালী এক কমিটি। ওই কমিটিতে স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়ক রাজকৃষ্ণ মণ্ডল সহ বহু কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। সংগ্রাম কমিটির সবাইও সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্রদের স্মরণে কালো ব্যাজ পরেছিলেন।

অন্নের আশায় গ্রামের মানুষ শহরে

একদিকে আন্দোলন-বিক্ষোভ, অন্যদিকে দু-মুঠো অন্নের আশায় দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে শুরু করলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ কলকাতার বড়ো বড়ো দৈনিকে সেইসব ছবি ছাপা হলো। সে সময়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, ২৪ পরগনা (তখন অখণ্ড) থেকে শয়ে শয়ে চাষি, জনমজুর, কলকাতায় এসে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছিলেন। উত্তর কলকাতার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষার পাত্র হাতে চাষি-ভিক্ষুকের হানা, একটুখানি ভাত বা কয়েক টুকরো বাসি রুটির জন্য তাদের কাতর আবেদন আকাশ-বাতাস মথিত করে তুলেছিল। খবরের কাগজের ভাষায়, 'নির্মোক শিশু কোলে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া মা, সঙ্গে উলঙ্গ শিশু। কয়েকটা ভাইবোন। না, অনেকদিন তাহাদের ভাত জোটে নাই ...। কিছু বাসি ভাত ও কয়েকখানা রুটি তাহাদের মিলিয়াছে। কিন্তু পেট কি তাহা মানিবে? কোনও কোনও অঞ্চলে ভিক্ষুকের "ভিড়ে" গৃহস্থের অলিন্দ দরজা সারাটা দিন বন্ধ। যেখানে দরজা খোলা সেখান হইতে আওয়াজ আসে, "মাপ করো", "হাত জোড়া"। "হাত জোড়া" পূর্বে ছিল অজুহাত। বাস্তবিক এখন অক্ষমতা। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষের ইহা ছাড়া কি বলিবার আছে?'

নুরুলের শেষ কথা

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত ষষ্ঠ শ্রেণির (মতান্তরে পঞ্চম শ্রেণি) কিশোর ছাত্র নুরুল ইসলাম দিনের পর দিন অর্ধাহারে, অনাহারে থাকার পর ২ টাকা দরে তিন কেজি চাল কিনে মাকে বলেছিল, 'মা, এই চাল রান্না করে ভাইবোনদের দাও। আমি চালের দাম কমাবার জন্য যাচ্ছি। যদি চালের দাম কমাতে না পারি, তবে তোমার নুরুল আর ফিরে আসবে না। আর যদি চালের দাম কমে, তবে তোমার নুরুল ফিরে এসে ভাত খাবে।' কিন্তু চালের মূল্য কমে নি আর সত্যিসত্যিই

নুরুল আর ফিরে আসে নি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, সন্ধ্যায় স্বরূপনগরে নুরুলের বাড়িতে গিয়ে এক দৈনিক পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক দেখেছিলেন, নুরুলের মা-দিদিমা, ছোটো ছোটো ভাই-বোন বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছে, আর নুরুলের বাবা নুরুলের কবরের সামনে বসে কবরের ওপর হাত বোলাচ্ছেন। আশেপাশে সর্বত্র গভীর শোকের ছায়া।

রাষ্ট্রীয় রোষের কবলে সম্পাদক

খাদ্য আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার হয়ে প্রতিবেদন লেখার 'অপরাধে' রাষ্ট্রীয় রোষের শিকার হতে হয়েছিল *দৈনিক বসুমতী* পত্রিকার (অধুনা বিলুপ্ত) তৎকালীন সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। ২০ ফেব্রুয়ারি,১৯৬৬ রবিবার বারাসত শহরে এক খাদ্য-সম্মিলনে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমন্ত্রিত প্রধান বক্তা। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার আগেই জানা গেল যে, তাঁর ওপর এক আদেশ জারি হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪(১) ধারা অনুসারে একমাসের জন্য বারাসত মহকুমার কোথাও শ্রী মুখোপাধ্যায় ঢুকতে পারবেন না। বারাসতের মহকুমা শাসক স্বাক্ষরিত সেই আদেশে বলা হয়েছিল : সরকারের কাছে খবর আছে যে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজারহাট, বারাসত, দেগঙ্গা, আমডাঙা ও হাবড়া থানা নিয়ে গঠিত বারাসত মহকুমার জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, জনসভায় ভাষণ দেবেন। বক্তৃতার বিষয় : বর্তমান খাদ্যসংকট ও অন্যান্য সাম্প্রতিক ঘটনাবলি। ওই বিষয়ে বিবেকানন্দবাবু যে ভাষণ দেবেন তা '... জনসাধারণকে এমনভাবে উত্তেজিত ও অশান্ত করিয়া তোলার সম্ভাবনা আছে যাহা পরিণতিতে জনসাধারণের জীবন, সম্পত্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করার মত হিংসাত্মক বেআইনী কার্যকলাপ সৃষ্টি করতে পারে ...।'

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সরকারি আদেশ অমান্য করেন নি। সে-সময়ের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আপাতত আইন অমান্যের ইচ্ছা তাঁর নেই। তবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর গতি রুদ্ধ করার বিনিময়ে বারাসতের মানুষের বরাতে চাল জুটবে তো?

অতুল্য ঘোষদের লীলা

সারা রাজ্যে খাদ্যের হাহাকারের মধ্যে তৎকালীন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতার আচরণ ছিল রীতিমতো বেদনাদায়ক। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন তো সমগ্র খাদ্য আন্দোলনকে 'গুণ্ডা-বদমায়েশ'দের কার্যকলাপ আখ্যা দিয়েছিলেন। পুলিশের প্রতিটি গুলি চালানোর ঘটনাকে জোরগলায় সমর্থন করেছিলেন। পাশাপাশি সে সময়ের পশ্চিমবঙ্গ তথা সর্বভারতীয় স্তরে বড়ো মাপের নেতা অতুল্য ঘোষের

আচরণ ছিল নির্মম, নিষ্ঠুর। তিনি খাদ্যের অভাব বা সংকটকে স্বীকারই করতে চাইতেন না। তাঁর মত ছিল : দেশের সব মানুষকেই দুবেলা খেতে হবে তার কোনো মানে নেই। সব দেশেই কিছু না কিছু উপোসী লোক আছে। নিঃসন্দেহে তাই এ-কথা বলা যায় যে, ১৯৬৬ সালে অতুল্য ঘোষের এই ধরণের বিবৃতি ও কার্যকলাপ ছিল রীতিমতো নিন্দনীয়।

খাদ্য আন্দোলনকে ঘিরে সারা পশ্চিমবঙ্গে যখন তুমুল উত্তেজনা-অশান্তি তার মধ্যেই ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ বেলেঘাটা নিউ সিআইটি রোডে কলকাতা কর্পোরেশনের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আয়োজন করা হয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বিরাট প্যান্ডেল। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় যখন 'মা, দুটি খেতে দাও মা', 'ফ্যান দাও'-এর হাহাকার পঞ্চাশের মন্বন্তরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তখন অভ্যাগত অতিথিদের আপ্যায়নের এলাহি ব্যবস্থা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এলেন মহামান্য অতুল্য ঘোষ। সামনে পিছনে গাড়ির মেলা। হঠাৎ সেখানে হাজির ছাত্রদের বড়োসড়ো একটি মিছিল। পুলিশের গুলিতে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদ জানাচ্ছিল তারা। মিছিল থেকে দু-চারটে ইট পাটকেলও পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজকেরা লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শোনা যায়, মঞ্চে বসে অতুল্যবাবু নাকি মিছিলকারী ছাত্রদের ওপর লাঠি চালানোর জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। কর্পোরেশানের তৎকালীন কংগ্রেসী কাউন্সিলর নরেন সেন লাঠি হাতে ছাত্রদের ওপর আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। সেদিন তাদের লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হন। ছাত্ররাও কংগ্রেসী নেতাদের বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। অতুল্যববু অবশ্য নিরাপদেই সেখান থেকে চলে যেতে সমর্থ হন। পরে বিরাট পুলিশবাহিনীর সাহায্যে প্রাথমিক স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় অতুল্যবাবু নাকি শালীনতার সব সীমা লঙ্ঘন করে কুৎসিত ভাষায় খাদ্য আন্দোলনের নিন্দা করেন। অথচ তিনি জানতেন যে, ওই আন্দোলনে প্রচুর কংগ্রেস নেতা ও কর্মী সামিল হয়েছেন। হুমায়ুন কবির, অজয় মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারাও প্রকাশ্যে পুলিশি বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছিলেন।

অজয় মুখার্জিকে কোণঠাসা করার চক্রান্ত

অতুল্য ঘোষ-রা জানতেন যে, তাঁদের রাজ্য সভাপতি অজয় মুখার্জি খাদ্য আন্দোলনের ওপর সরকারি এবং পুলিশের দমন-পীড়ন মেনে নিতে পারছেন না। অজয়বাবু প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন, সাম্প্রতিক (১৯৬৬) খাদ্য আন্দোলনকে যদি কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থসিদ্ধির আন্দোলন বা কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের হুজুগ বলে সরকার মনে করেন বা সেইরকম প্রচার চালাতে থাকেন, তাহলে সরকার খুবই ভুল

করবেন। শুধু তাই নয়, খাদ্য আন্দোলনের সময়ে যে-সব নাশকতামূলক কাজ হয়েছে, তার জন্য খাদ্য আন্দোলনকে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করাও ঠিক হবে না। কিন্তু সে সময়ের প্রফুল্ল-অতুল্যচক্র এসব যুক্তিতে কান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁরা অজয়বাবুর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হয়। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে অজয় মুখার্জি বলেন, '৪৫ বছর কংগ্রেসের সেবা করছি এবং মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজ করতে এসেছিলাম। কিন্তু কাজে হাজারো বাধা পেয়েছি। বর্তমানে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে, এই প্রস্তাবে আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ বা কেন আমাকে অপসারণ করা হচ্ছে তার কোনো কারণ দেখানো হয় নি। ... এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, প্রদেশ কংগ্রেসে ঘুণ ধরেছে ...।'

সে-সময় অজয় মুখার্জি নিঃসন্দেহে সঠিক পথের দিশারী হয়ে উঠেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে সেই উত্তাল সময়ে আত্মবিশ্লেষণেরও প্রয়োজন ছিল। খাদ্য আন্দোলন এমন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করল কেন, আর কেনই বা নাশকতামূলক কাজ অন্যায় জেনেও এত মানুষ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে পথে পা বাড়ালেন, তার কারণ বোঝার জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজের গভীরে অনুসন্ধান চালানোর প্রয়োজন ছিল। তাচ্ছিল্য করে বা প্রচারের মারপ্যাঁচে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে, আর যাইহোক, বাস্তবকে যে ঠকিয়ে রাখা যায় না, বরং তা আরও রুদ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, সে বোধ তৎকালীন কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। ফলে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অজয় মুখার্জি নিজের পদ খোয়ালেন।

মূল্যবান পর্যালোচনা

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সময় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কিছু সংখ্যক দায়িত্বসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বলেছিলেন :

১. দেশে খাদ্যাভাব আছে, তা সরকার নিশ্চয়ই অস্বীকার করেন না। সরকারের খাদ্য ব্যবস্থা সফল হয় নি, তাও সরকার স্বীকার করেছেন। খাদ্যাভাবে ও কিছু কিছু অব্যবস্থায় মানুষের কষ্ট হচ্ছে তা নিশ্চয়ই সরকার অস্বীকার করতে পারবেন না। তবুও সরকার 'এই আন্দোলন কী খাদ্যের জন্য?' — এমন প্রশ্ন তুলে ক্ষুধার্ত মানুষকে আরও ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন।

২. খাদ্য আন্দোলনের সময় যে-সব নাশকতামূলক কাজ হয়েছে, অনেকেই তার নিন্দা করেছেন। ওই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছেন। সুতরাং নাশকতার কথা তুলে খাদ্য আন্দোলনকে হেয় করতে চাইলে ফল খারাপ হতে বাধ্য।

৩. নাশকতামূলক কাজের জন্য সরকারও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। খাদ্য আন্দোলনের শুরুতেই সরকার-বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করে দেয়, ফলে নেতৃত্ব চলে যায় জনতার হাতে। সরকারের উশ্‌কানি ও পুলিশের বাড়াবাড়ি জনতাকে উত্তেজিত করেছিল। বরং দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশের হস্তক্ষেপের পরই উত্তেজিত জনতা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় জনতার উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. জনতার ক্ষোভের নানারকম কারণ আছে। সেগুলি নিরপেক্ষ ও ধীর চিত্তে অনুসন্ধান করা দরকার। আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর দোষারোপ করে বাস্তবকে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

৫. আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে চলতে দিলে, তা কখনই হিংসাত্মক পথ নেয় না।

আন্দোলনের বিস্তার ও অব্যাহত পুলিশি দমন-পীড়ন

খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে ছাত্র ও জনতার আন্দোলন ২৪ পরগনার উত্তর থেকে দক্ষিণে, হুগলি, নদিয়া, মেদিনীপুর, এমনকী উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও হালতু, বনগাঁ, বেহালা, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, হাবড়া, রাণাঘাট, ক্যানিং প্রভৃতি স্থানে ছাত্র ও যুবকদের শোভাযাত্রা বের হয়। সরকারি দপ্তরগুলির সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কয়েকটি স্থানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। বনগাঁয় এক ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালায়। দশজন কিশোর ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। কলকাতা, রাণাঘাট, হাবড়া, বসিরহাটে পুলিশ যাকে সামনে পায় তাকেই গ্রেপ্তার করে।

এদিকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে বিরাট এক ছাত্র সংগঠনের শোভাযাত্রা রাজভবনের দক্ষিণ ফটকের সামনে পৌঁছোয়। হাজার হাজার ছাত্রের ওই মিছিল বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। তাদের শ্লোগান ছিল : 'লাঠি নয়, গুলি নয়, খাদ্য চাই— ছাত্র হত্যার জবাব চাই, আটক বন্দিদের মুক্তি চাই।' ওই দিন সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে ছাত্রছাত্রী ওই বিক্ষোভ-সমাবেশে যোগ দেয়।

ময়দানে জনসভা

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, দুপুরে ময়দানে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। সিপিআই, সিপিআইএম, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য একাধিক দলের ডাকা জনসভা মানুষের ভিড়ে উপচে পড়ে। সভায় শপথ নেওয়া হয়, যতদিন না এই কংগ্রেস

সরকার পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ন্যায্যমূল্যের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করবে, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া ও বসিরহাটে পুলিশের গুলি চালনার নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করবে এবং যে সমস্ত জননেতাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে তাঁদের মুক্তি দেবে, ততদিন এই সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক পন্থার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য। ভাষণ দেন সাধন গুপ্ত, সোমনাথ লাহিড়ী, যতীন চক্রবর্তী, অনাদি দাস, অনিলা দেবী প্রমুখ। জনতাকে শপথ বাক্য পাঠ করান নিখিল দাস।

বারাসতে তুমুল বিক্ষোভ

বসিরহাট, বাদুড়িয়ার পরে খাদ্যের দাবিতে সাধারণ মানুষের আন্দোলন বারাসত ও হাবড়ায় রুদ্র মূর্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে সমগ্র এলাকা অচল হয়ে পড়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ কার্যত গণজাগরণের রূপ নেয়। ট্রেন, বাস, গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাজার-হাট-কলকারখানার দরজা ছিল সম্পূর্ণ রুদ্ধ। হাজারে হাজারে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। গড়ে ওঠে গণঅবরোধ। পুলিশ প্রথমে লাঠি চালায়। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশকে পাল্টা আক্রমণ করে। বারাসত স্টেশনের কাছে একটি সরকারি গাড়ি পুড়িয়ে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। পুলিশ পিছু হটে। কিন্তু ঘুরপথ দিয়ে বারাসত অঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে পড়ে। বাড়ি বাড়ি নির্বিচারে তল্লাশি চালায়। বাড়ির মহিলারাও দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মহিলাদের রুদ্রমূর্তির সামনে পুলিশ শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচে। তবে যাওয়ার আগে একাধিক বাড়ির দরজা জানালা ভেঙে, জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়ে যায়।

শিলিগুড়িতে হরতাল

২৩ ফেব্রুয়ারি সমগ্র শিলিগুড়িতে হরতাল পালন করা হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্কুল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের ডাক দেয়। কয়েক হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল গোটা শহর পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে, 'খাদ্যের দাবিতে বাংলার ছাত্রসমাজ লড়ছে, লড়বে।'

হাবড়ায় হরতাল

২৩ ফেব্রুয়ারি সারাদিন হাবড়ায় খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে হরতাল পালিত হয়। উত্তেজিত জনতা রেল সিগন্যালের তার কেটে দেয় ও রেললাইনের ওপর ট্রলি ভ্যান উপুড় করে দিয়ে অবরোধ রচনা করেন। বারাসতে এসডিও, এসডিপিও এবং ডিএসআরপি হাবড়ায় গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন ও ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তত কেরোসিন সরবরাহ চালু রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

ময়দানে আবার বিশাল জনসভা

প্রচণ্ড খাদ্য-বিক্ষোভের তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, মনুমেন্টের (তখনও শহিদ মিনার নাম হয় নি) ময়দানে বিরাট জনসভায় সরকারি খাদ্য ও দমননীতিকে ধিক্কার জানানো হয়। সেই জনসভায় কত মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন? পুলিশের হিসাবেই এক লাখ। সে-সময়ের দৈনিকগুলিতে লেখা হয়েছিল : '... ময়দানের সঘন অন্ধকার লাখ লাখ মানুষের ক্রুদ্ধ কণ্ঠের গর্জনে ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতে থাকে। চতুর্দিক হইতে অওয়াজ ওঠে "সস্তা দরে খাদ্য দাও— নইলে গদি ছেড়ে দাও"। "ভারতরক্ষা আইন ও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করো" (প্রসঙ্গত, ১৯৬২ সালে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল), "রাজবন্দিদের মুক্তি দাও", "বসিরহাটের পুলিশি গুলির জবাব চাই।" ... সভায় একের পর এক বক্তা যখন সরকারি খাদ্যনীতিকে ধিক্কার দিয়া ইহাকে পরাস্ত করিতে আহ্বান জানান তখন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের প্রচণ্ড গর্জনে সভাস্থল ফাটিয়া পড়ে ...।'

ছাত্রদের বিক্ষোভে পালিয়ে গেল পুলিশ

৩ মার্চ (১৯৬৬) সকালে বসিরহাট কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক অজয় চক্রবর্তীকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করলে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কয়েকজন ছাত্র যে-পুলিশ ভ্যানে অজয়কে তোলা হয়েছিল তার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ভয় পেয়ে পুলিশের গাড়িটি রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটতে থাকে। তখন সকাল প্রায় ৯টা। রাস্তার বিপরীত দিক থেকে একটি সাইকেলে চড়ে দু'জন আরোহী বসিরহাটে আসছিলেন। পলায়নরত পুলিশের গাড়িটি মুহূর্তের মধ্যে 'সাইকেল আরোহী দু-জনের একজনকে পিষে মেরে ফেলে। অন্যজনও সামান্য আহত হন। মৃত ব্যক্তির নাম মুজিবর রহমান।

কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত

কলকাতায় ছাত্র-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ

৩ মার্চ ১৯৬৬। কলকাতা থেকে ১০০ মাইল দূরে কৃষ্ণনগরে পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও শেষ পর্যায়ে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। সংবাদে প্রকাশ, ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ওই দিন সকাল ১১টায় ছাত্ররা ধর্মঘট করেন। এলাকার অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পথে নেমে বিশাল মিছিল বার করে। পুলিশ আচমকা কৃষ্ণনগর বড়ো পোস্ট অফিসের মোড়ে মিছিলের গতি রোধ করে। বিনা প্ররোচনায় ছাত্রদের ওপর ব্যাপক লাঠি চালাতে শুরু করে। বহু ছাত্র আহত অবস্থায় এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করতে থাকেন। ঠিক সেই সময় পুলিশের ওপর

অবিরল ধারায় ঢিল-পাটকেল পড়তে থাকে। পুলিশবাহিনী তখন গুলি চালায়। গুলিতে স্থানীয় এভি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আনন্দ হাইত মারা যায়। অনাথ পাল, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও ৮ জন ছাত্র বুলেটের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়। এর পরেও পুলিশ ছাত্রদের তাড়া করতে করতে আশপাশের বাড়ি ও সরকারি অফিসগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। তখন ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ। শুরু হয় পুলিশ-জনতা প্রতিরোধ-খণ্ডযুদ্ধ। বেশ কিছু সময় ধরে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ চলবার পরে বেলা ১টা নাগাদ সরকারি খাদ্য দপ্তরে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা যায়। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে পরপর আরও চারটি সরকারি বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা যায়। সরকারি খাদ্য ও স্কুল বোর্ড অফিস, সাব পোস্ট অফিসের দোতলা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় আবগারি দপ্তরের অফিস, নিউ কালেক্টরেট অফিস ও কৃষি দপ্তরেও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন এসে কয়েকটি অফিসের আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। কিন্তু ততক্ষণে দপ্তরগুলির ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যায়। ওই দিন সারা কৃষ্ণনগর শহরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়।

৪ মার্চ ১৯৬৬, কলকাতার শিয়ালদহ-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশের কয়েক দফা খণ্ডযুদ্ধ বাধে। সংবাদে প্রকাশ, ছাত্র সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে ছাত্র ধর্মঘট উপলক্ষে বেলা ১১টা থেকে মধ্য ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা রাজপথে নেমে আসেন।

ওই দিন অর্থাৎ ৪ মার্চ বেলা ১২ টার পরে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে কয়েকশো ছাত্র বিক্ষোভ-সমাবেশ করেন ও শোভাযাত্রা বার করেন। একই সময়ে শ্যামপুকুর শৈলেন্দ্র সরকার স্কুলের সামনে থেকে ছাত্রদের একটি মিছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (অধুনা বিধান সরণি) ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগোতে থাকে। তারপর মিছিলটি দুপুর ১ টা ২০ নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনের সামনে এসে পৌঁছে, রাস্তার ওপর বসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোডে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়। বিশাল পুলিশ বাহিনি ছুটে আসে। পুলিশ দেখে ছাত্র এবং এমনকী সাধারণ জনতাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের সমবেত ধিক্কার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ।

পুলিশের লাঠি আর টিয়ার গ্যাসের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ইট-পাটকেল। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে বউবাজার স্ট্রিট, সার্কুলার রোড, বিবেকানন্দ রোড ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খণ্ডযুদ্ধ চলে। ক্ষণে ক্ষণে জনতার দুর্গ ও পুলিশের দুর্গ পালটাতে তাকে। পালটাতে থাকে সংঘর্ষের ছবিও। বিবেকানন্দ রোডে একটি দোতলা বাসে আগুন ধরিয়ে দেন ছাত্র-জনতা। দমকল আসার আগেই 'বাসখানির লোহার কাঠামো ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না'।

এর কিছু সময় পরে হ্যারিসন রোড (অধুনা মহাত্মা গান্ধী রোড) কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একখানা একতলা ও দুটি দোতলা বাসে আগুন লাগানো হয়। তারপর গ্রে স্ট্রিটের একটি ট্রামে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ একশো রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ও অজস্রবার লাঠিচার্জ করে। শিয়ালদা স্টেশনের ভিতরে ঢুকেও পুলিশ লাঠি চালায় ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। স্টেশনে অপেক্ষমান শত শত যাত্রী ও পথচারী কাঁদানে গ্যাসের শিকার হন।

দিকে দিকে দাবানল : পুলিশের গুলি, নিহত ৩

৫ মার্চ, ১৯৬৬। খাদ্যের দাবিতে গণবিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুরে সেনা তলব করে প্রফুল্ল সেন সরকার। সারাদিনের জন্য কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু ওই কারফিউ-এর মধ্যেই হাজারে হাজারে ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে পড়েন। টহলরত সেনাবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে জনতাকে হটিয়ে দেয়। সেদিনের সেই গণপ্রতিবাদের ছবি ফুটে ওঠে বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। *দৈনিক বসুমতী*তে লেখা হয় : 'কৃষ্ণনগরের অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে। উত্তেজিত জনতা। চারিদিকে অরাজকতা। নদিয়ার জেলাশাসকের চোখেমুখে উদ্বেগ। কৃষ্ণনগর স্টেশনটি তখন পুড়িতেছে। আগুনের লেলিহান শিখা কুণ্ডলী পাকাইয়া তখন উপরে উঠিতেছে। উদ্বিগ্ন জেলাশাসক রাজ্যের প্রধান সচিবের কাছে এক উদ্বেগ কাতর জরুরি বার্তা পাঠাইলেন। বার্তাটির বয়ান নিম্নরূপ : অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে। জনতা মর্গটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। ওই দিকে কৃষ্ণনগর স্টেশনটি জ্বলিতেছে। জনতা পুলিশ অফিসারদের প্রহার করিতেছে। গুলি শুরু হইয়াছে। চারিদিকে ব্যাপক লুঠতরাজ চলিতেছে। আমার কী কর্তব্য বলুন ...। এই জরুরি বার্তাটি মহাকরণে আসিয়া পৌঁছাইবার অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণনগর অভিমুখে সৈন্যদল পাঠানো হয় ...।'

ইন্দিরার 'অমৃত ভাষণ' ও কলকাতা সফর

খাদ্য আন্দোলনের কারণে আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি এক কথায় 'কমিউনিস্টদের গুণ্ডামি' বলে উড়িয়ে দেন। তারপর জানিয়ে দেন, আগামী দু-মাসে খাদ্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এ-ব্যাপারে সরকারের কিছুই করার নেই। ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এক সময়ে লোক পঙ্গপালের মতো মরলে তাকে দুর্ভিক্ষ বলা হতো। সেই অর্থে ভারতে দুর্ভিক্ষ নেই ...। ৫ মার্চ, ১৯৬৬ দিল্লিতে বসে উপরোক্ত মন্তব্য করার পরে ৬ মার্চ অপরাহ্নে বিশেষ বিমানে চেপে দমদমে নামেন ইন্দিরা গান্ধী। উদ্দেশ্য : নদিয়ার পরিস্থিতি পর্যালোচনা। বিমানবন্দর থেকে সোজা রাজভবনের বিলাসবহুল আশ্রয়ে বসে ইন্দিরা কতটা কি করলেন বোঝা

যায় নি। তবে সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন প্রমুখদের সঙ্গে চা চক্রে সাংবাদিকদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেওয়ায় 'গভীর দুঃখ প্রকাশ' করলেন। বললেন, 'সম্পত্তির হানি ঘটিয়ে খাদ্য সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা যায় না।' এইটুকু বলে রাজভবনে রাত্রিযাপন করে প্রধানমন্ত্রী পরের দিন ৭ মার্চ, (১৯৬৬) সকালে 'মিজো পাহাড়ের অবস্থা দেখতে' (মিজোরামে তখন চলছে মিজো জনজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম) ওই বিশেষ বিমানেই আসাম চলে গেলেন। ওই কয়েক ঘণ্টায় প্রধানমন্ত্রীর জন্য কত টাকা খরচ হলো বুভুক্ষপীড়িত পশ্চিমবঙ্গবাসী তা জানতেই পারলেন না। তবে এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ইন্দিরাকে দেখতে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। সে-সময়ের কাগজের বিবরণ অনুযায়ী, 'দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে রাজভবন পর্যন্ত দীর্ঘ আট মাইল রাজপথের দুইধারে এবং বাড়ির অলিন্দে ও ছাদে হাজার হাজার নর-নারী ও শিশুকে করজোড়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতে দেখা যায় ...।'

সারা বাংলায় পূর্ণ হরতাল, পুলিশের চণ্ডরূপ

১০ মার্চ, ১৯৬৬। বাংলা বন্‌ধের ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র পশ্চিমবাংলার মানুষ রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে ধর্মঘটের ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করলেন। পাশাপাশি কলকাতা, খড়দহ, কোন্নগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় গুলি চালিয়ে, মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুট করে নতুন নজির সৃষ্টি করল কংগ্রেস সরকারের পুলিশ। পুলিশের গুলিতে সেদিন প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ১০ জন। তবে বেসরকারি সূত্রে পাওয়া নিহতের তালিকাটা ছিল এইরকম, কলকাতা : ৩, খড়দা : ৩, কোন্নগর : ২, রিষড়া : ৩। হিন্দ মোটরস : ৭, আসানাসোল : ৩, শ্রীরামপুর : ৪। মোট : ২৫ জন।

প্রফুল্ল সেনের নির্মম রসিকতা

১০ মার্চ (১৯৬৬) অপরাহ্ণ। প্রায় তিনটে বাজে। কলকাতার সাংবাদিকরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ঘরে ঢুকেছেন রাজ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি নিতে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের কোন্নগর, হিন্দমোটরস, রিষড়া প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের রেল স্টেশন চড়াও আর পুলিশের গুলিতে মোট ১২ জনের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। তারপর কাব্য করে বললেন , 'কৃষ্ণনগর ডুবুডুবু, কোন্নগর ভেসে যায় রে ...।'

হরতালের দিন এমএলএ-দের জন্য ভুরিভোজের ব্যবস্থা

দৈনিক বসুমতী-র (১০ মার্চ ১৯৬৬) খবর অনুযায়ী, 'পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সংসদীয় দল হরতালের দিনে বিধানসভার অধিবেশন চালানোর জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া

ফেলিয়াছেন। কংগ্রেস সদস্যগণ লাউডন স্ট্রিটে শ্রী অশোককৃষ্ণ দত্তের বাড়িতে, চৌরঙ্গি রোডের কংগ্রেস ভবনে এবং রাজভবনস্থ মন্ত্রিবর্গের বাড়িতে নিশিযাপন করিবেন। খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে বিধানসভা ভবনস্থ রেস্তোরাঁয়। মেনু ঠিক জানা না গেলেও সন্ধ্যার পূর্বে ডজন তিনেক মুরগি আনিতে দেখা গিয়াছে। কংগ্রেস সদস্যদের কুপন দেওয়া হইবে — কুপন দেখাইলেই মিলিবে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার।'

আবার গুলি, আবার মৃত্যু-হাহাকার-আগুন-বিক্ষোভ

হরতালের পরের দিন অর্থাৎ ১১ মার্চ, ১৯৬৬ কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ওইদিনও হাওড়ার শিবপুর, কলকাতার বেহালা, গড়িয়া, কামারহাটি, আগরপাড়া, বেলঘরিয়া, বরানগর এবং ২৪ পরগণার বনগাঁ ইত্যাদি অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলি চালায়। নিহত কমপক্ষে ১৩ জন। আহত অসংখ্য। প্রায় সমস্ত লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি জায়গায় জনতা ট্রেন অবরুদ্ধ করে রাখে। কলকাতায় সারাদিন বাস বন্ধ থাকে। সকালের দিকে একখানা ট্রামে আগুন লাগানোর পর সমস্ত ট্রাম চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ওইদিন আরও উগ্র, আরও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। বেহালার বিক্ষুব্ধ জনতা একটি সরকারি বাসের গুমটি ও পোস্ট অফিস পুড়িয়ে ফেললে পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে দশ বছরের একটি বালক নিহত ও আরও চার-পাঁচজন আহত হয়। বেহালার জনৈক চিকিৎসক সকাল ১১টা নাগাদ গুলিতে গুরুতর আহত এক ব্যক্তিকে ট্রাম রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে তাকে নিজের গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় থানার সামনে পুলিশ ওই গাড়িটি থামায় ও কোনো কথায় কান না দিয়ে গুলিবিদ্ধ মানুষটিকে টেনে নামিয়ে রাস্তায় ফেলে লাথি মারতে মারতে থানার কাছে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেল ওই চিকিৎসক ও তাঁর গাড়ির চালককেও প্রচণ্ড মারধোর করে পুলিশ। গুলিতে আহত মানুষটি রাস্তার ওপরেই মারা যান। পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

১১ মার্চ, ১৯৬৬ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলনের খতিয়ান : নিহত ৫০, গুরুতর আহত ৩০০, গ্রেপ্তার ৭ হাজার।

ক্ষুধার মিছিলের কবিতা

১৩ মার্চ (১৯৬৬)। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৌন মিছিল বার হলো কলকাতা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে। সংবাদমাধ্যমের ভাষায় : 'সমুদ্রের মত বিরাট-মহান, কিন্তু সমুদ্রের গর্জন ইহাতে ছিল না। ইহা ছিল অন্তর্গর্জনা এবং মহামৌন মহাশব্দের মহান মিছিল।'

বাস্তবিকপক্ষে সে সময়ের প্রায় সবকটি পত্র-পত্রিকায় ওই দিনের মিছিলকে অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় বলা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল : কলকাতা মহানগরীতে অবিস্মরণীয় যে মৌন মিছিলটি বের হয়, দৃপ্ত অথচ শোকনম্র পদধ্বনি ছাড়া তার কোনো সরব অভিব্যক্তি ছিল না, তবু তার ভাষা ছিল সুস্পষ্ট, আবেদন ছিল অন্তরস্পর্শী। শান্ত অশান্ত লক্ষাধিক মানুষের অপরূপ ওই মিছিলটি 'মিছিল নগরী' কলকাতাতেও নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কালো পতাকা, অর্ধনমিত রক্তপতাকা, ফেস্টুন, শহিদদের প্রতিকৃতি আর সুসজ্জিত শহিদ বেদীকে অগ্রভাগে রেখে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বিপুল বিশাল ওই মিছিল শ্যামবাজার অভিমুখে এগোনোর সময় অগুণতি, অসংখ্য জনতা 'দণ্ডায়মান' থেকে শোকনম্র হৃদয়ে শহিদদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানান। কলকাতা যেন ছেয়ে যায়, ভেসে যায় মিছিলে মিছিলে। শুধু কলকাতা নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে ওই একই ছবি দেখা যায়। মিছিলকে স্মরণ করে জনৈক কবি বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী একটি অসাধারণ কবিতা লেখেন *দৈনিক* বসুমতী- র ১৪ মার্চ, ১৯৬৬ সংখ্যায় 'মৌন মিছিল' শিরোনামে :

'পথ বহুদূর — সামনে চড়াই— তবুও মিছিল এগিয়ে যাও,
রাত কতো হলো— প্রশ্ন করো না, শুধু বোবাদের ভরসা দাও
মৌন-মিছিলে যদি জাগে আজ ভাঙা পাঁজরের যন্ত্রণা,
তবু রোদে-পোড়া হাসিমুখে দাও এগিয়ে চলার মন্ত্রণা।
স্তব্ধ বাতাস : মাথার আকাশ ব্যথার ভারেতে নামতে চায়,
পথের সাথীকে পথে ফেলে এসে বুঝি মন তোর কান্না পায়।
তবু সাবধান শহিদের স্মৃতি বুকের আগুনে জ্বেলে রাখিস,
ক্লান্তিলগ্নে রক্ত-তিলক সাথীর কপালে পরিয়ে দিস।
থেমো না মিছিল — সামনে অদূরে শেষ বাঁক বুঝি রয়েছে ওই;
হৃদয় এখন প্রশ্ন করো না — কী পেতে পারতে পেয়েছো কই?
আজকে মিছিলে স্বপ্না, তোমার বাসর পাতার সময় নাই,
তার চেয়ে এসো মৌন-মিছিলে বুকের আগুন ছড়িয়ে যাই।
মিছিলে মিছিলে মিশে যাক আজ তোমার-আমার ছোটো জীবন;
মহাজীবনের ডাক শুনে আজ খুলবে না দ্বার কোন্ কৃপণ?
নতুন সমাজ — নতুন হৃদয় — নতুন কবিতা মিছিল চায়
ক্ষুধার মিছিল, দাবির মিছিল, মৌন মিছিল — মিছিল যায়।

অব্যাহত পুলিশি তাণ্ডব

পরিস্থিতি যখন অপেক্ষাকৃত শান্তির পথে এগোচ্ছিল, তখনও সাধারণের ওপর অব্যাহত থাকে পুলিশের ব্যাপক বে-পরোয়া যথেচ্ছ আক্রমণ। ২৪ পরগণা ও হুগলির কয়েকটি

উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে পুলিশের অত্যাচার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রিষড়া স্টেশনের পূর্ব দিকের কলোনির কয়েক হাজার নরনারী নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে সংলগ্ন মাঠে আশ্রয় নেন। সোদপুরের মতিলাল কলোনি, প্রিয়নগর কলোনি, রানি রাসমণিনগর কলোনি, কল্যাণনগরী ও শান্তিনগরেও পুলিশ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। দমদমে শেঠ কলোনি, অঞ্জনগড় কলোনি, মনোহর কলোনি, রায়মল্লিক কলোনি, বহিরাগত কলোনি, লালগড় কলোনি ইত্যাদি উদ্বাস্তু জনপদগুলিতেও পুলিশ ভয়াবহ নির্যাতন চালায়। সব জায়গায় একই ধরণের কাহিনি। পুলিশ ঘরে ঘরে ঢুকে যথেচ্ছ মারপিট ও যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করতে থাকে। মহিলারাও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। এক রিষড়াতেই ১৩ মার্চ (১৯৬৬) মোট ১০৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খড়দহে পুলিশের লুঠতরাজ

খড়দহে গ্রেপ্তার ও মারপিটের সঙ্গে চলছে পুলিশের অবাধ লুঠতরাজ। ১৩ মার্চ (১৯৬৬) সকালে একদল পুলিশ রহড়া বাজারে ঢুকে মাছ, তরি-তরকারি, ফলমূল, সিগারেট, মিষ্টি ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যায়।

সমস্ত ঘটনার দায় শরণার্থীদের ঘাড়ে চাপালেন অতুল্য ঘোষ

চারদিকে মৃত্যু, হাহাকার, নির্যাতন ও তার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিদ্রোহ-প্রতিবাদ, এ-সব বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে নি তৎকালীন কংগ্রেসী দলনেতা অতুল্য ঘোষের উপর। উলটে তিনি পশ্চিমবঙ্গের যত কিছু অভাব, দুঃখ-দারিদ্র্য, সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ, আন্দোলন সব কিছুর দায় চাপালেন পূর্ববাংলার শরণার্থীদের ঘাড়ে । ১৪ মার্চ কড়া পুলিশ পাহারায় বসে এক বিবৃতিতে অতুল্য ঘোষ বললেন : পূর্ববাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুরা মূলত গুণ্ডা প্রকৃতির। তারা প্রায়শই মারমুখী ও লুণ্ঠন-বাজ। খাদ্য আন্দোলনের নামে কলকাতা ও তার আশেপাশে এই শ্রেণির মানুষেরাই গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছে।

পরিস্থিতির জন্য সেন-ঘোষকে দায়ী করল কংগ্রেসীরাই

১৫ মার্চ (১৯৬৬) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্মী সংঘের তরফ থেকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দর হাতে একটি স্মারক লিপি জমা পড়ে। স্মারকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানানো হয়। বলা হয়, রাজ্যের শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এমতাবস্থায় চারিদিকে আওয়াজ উঠেছে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই অচলাবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য এ-ছাড়া অন্য পথ

নেই। স্মারকলিপিতে কংগ্রেস কর্মীরা আরও জানান, এই কুশাসনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষই দায়ী।

রাজ্যের খাদ্য দপ্তর ১৯৪৭ সাল থেকে প্রফুল্ল সেনের অধীনে আছে। সুতরাং রাজ্যের খাদ্য সংকটের জন্য তিনি ছাড়া আর কে দায়ী হবেন? বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন ও তাঁদের অনুগত বন্ধুদের অপসারিত না করা হয় তাহলে তাঁদের কুশাসনে ভারতের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তৎকালীন সুপরিচিত কংগ্রেসকর্মী অজিতেশ্বর ভট্টাচার্য, রামনলিনী চক্রবর্তী, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, রবি চৌধুরী, রণবীর বর্মণ, ভুবন মোহন সাহা, বি ঘটক, সি ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডা. নলিনাক্ষ সান্যাল, দুর্গাপদ দাশ, বিজয় মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

খাদ্যনীতির পরিবর্তন দাবি করলেন নলিনাক্ষ সান্যাল

১৫ মার্চ বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা নলিনাক্ষ সান্যাল কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সি. সুব্রহ্মনিয়মের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্যনীতির বেশ কিছু পরিবর্তনের দাবি জানান। তিনি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের কুশাসন ও দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন। সান্যালের দাবি ছিল : কয়েকটি ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত সংলগ্ন এলাকাকে উপযুক্তভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অবিলম্বে কর্ডন এলাকার পরিধি বৃদ্ধি, সংশোধিত রেশন এলাকায় নিম্নতম সাপ্তাহিক রেশন বজায় রাখার জন্য আরো বেশি পরিমাণ গম সরবরাহ, চালের সরবরাহ যদি কম থাকে তাহলে কলকাতা ও শহরতলী-শিল্পাঞ্চল (পূর্ব রেশন এলাকাসমূহ) ছাড়া অন্যত্র তা বিনিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লেভিতে চাল ও ধানের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ।

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং সেই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চেহারা তৎকালীন কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠীকে এতটাই বিচলিত করেছিল যে, ছোটো-বড়ো বেশ কয়েকজন নেতা শুধু কংগ্রেস দল নয় চিরদিনের মতো রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। আবার ওই আন্দোলনের ধাক্কায় জেলা-স্তরের অনেক কংগ্রেস নেতার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। বুভুক্ষু মানুষের ন্যায্য প্রতিবাদকে এঁরা কুৎসিতভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হন নি, আন্দোলনকারী বহু মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, পুলিশের সাহায্যে তাদের ওপর দৈহিক-মানসিক নির্যাতন চালানো, ঘরের মহিলাদের বেইজ্জত করা ইত্যাদি অপকর্মে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ওই কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই আর গ্রামে থাকতে পারেন নি।

সাম্প্রতিক রেশন বিদ্রোহের সময় সিপিআইএমের কিছু জেলা নেতার আচার-আচরণ কিংবা কার্যকলাপও অবিকল সেদিনের কংগ্রেসীদের মতো হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার আত্মগর্বে উদ্ধত, ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন, এই অন্ধ নেতারাও সেদিনের মতোই হুবুহু একই সুরে কথা বলছেন! আমরা বরং একটু একটু করে ২০০৪-এর আমলাশোল থেকে আজকের অর্থাৎ ২০০৭-এর রেশন কেলেঙ্কারির ধারাবিবরণীটি একটু ঝালিয়ে দেখি।

আমলাশোল ২০০৪

গ্রামের নাম আমলাশোল। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি থেকে কাকড়াঝোর হয়ে পাহাড়ি পথে আরও বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে ঝাড়খণ্ডের সীমানায় এই গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বড়োজোর ২০টি পরিবারের বাস। ২০০৪ সালের ১০ জুন সব দৈনিকে খবর বেরোল, গত তিন মাসে এই গ্রামে পাঁচজন মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা সিপিআইএমের নেতা কৈলাশ মুড়া লিখিতভাবে খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। স্পষ্ট ভাষায় জানালেন : 'আমলাশোল গ্রামে লোকগুলো সব খেতে না পেয়ে মরছে। গ্রামের গরিব লোকগুলো ধড়াধড় মরছে। বিডিও শুনছে না, পঞ্চায়েত প্রধান শুনছে না। আমি অত পার্টিটাটি বুঝি না। আমার এখানে ঝাড়খণ্ডের পঞ্চায়েত। তারা আমার কথায় বিশেষ আমল দেয় না।' (সূত্র : *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১০ জুন, ২০০৪।)

কৈলাশ মুড়ার কথায় আমল দেন নি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। ১৯৬৬ সালের খাদ্যের দাবিতে বুভুক্ষু মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই চালানো সেদিনের যুব নেতা, আজকের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শুধু বললেন, 'অনাহার নয়, অনাহারের পরিস্থিতি রয়েছে আমলাশোলে।' ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারিতে খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে জেলে গিয়েছিলেন বুদ্ধবাবু; আর এবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মহাকরণে বসে কেবল 'উদ্বেগ' প্রকাশ করে 'উচ্চ পর্যায়ের তদন্তে'র নির্দেশ দিলেন। কারা তদন্ত করলেন? সিপিআইএম-এর এক মন্ত্রী আর জেলা পরিষদের সভাধিপতি। অন্যদিকে স্থানীয় বিডিও শুভাশিষ বেজ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন : এখানে কেউ অনাহারে মরতেই পারে না। জঙ্গলে কাঠ কেটেই তো এদের দিনে ১০০ টাকা রোজগার। বিডিও মশাইয়ের এহেন যুক্তি স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রী আর জেলা পরিষদের সভাপতিকে তদন্তে দারুণ উৎসাহ জুগিয়েছিল। তাঁরা তদন্ত করে দেখলেন যে, কৈলাশ মুড়া ডাহা মিথ্যা বলে খবরের কাগজে 'হিরো' বনতে চেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিন্ত হলেন!

কিন্তু কার্যত কৈলাশ মুড়া নয়, তদন্তের আদেশ দিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর সরকার অনেকেরই প্রভূত প্রশংসা আদায় করে নিলেন। 'বাম'-ঘেঁষা খবরের কাগজে লেখা হলো, অনাহারে মৃত্যুর সংবাদে অন্যান্য রাজ্য যেখানে উদাসীন থাকে, বুদ্ধদেব-বাবুর সরকার সেখানে তদন্তকর্ম ও যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো শৈথিল্য দেখায় নি। এই একটি ব্যাপারে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করতেই হয় ...।

আমলাশোলের পর কুমারপুকুর

সিপিআইএম-এর দীপক সরকারের ঘোষণা 'সিপিআইএম জমানায় কেউ না খেতে পেয়ে মরে না'-কে মিথ্যা প্রমাণ করে আবার নিরন্ন মানুষের লম্বা ছায়া ঘনিয়ে উঠল। আবার শোনা গেল অনাহারে তিলে তিলে অবধারিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ধারাবিবরণী। এবারের ভাষ্যকার বাদিয়া মুণ্ডা। আর তিনিও সিপিআইএম কর্মী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুরের খেয়াদহ-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। পঞ্চায়েতটি সিপিআইএম পরিচালিত। বাদিয়া মুণ্ডা জানালেন : 'আমাদের পঞ্চায়েতের কুমারপুকুর গ্রামের মানুষ দুবেলা খাওয়ার অভাবে ধুঁকছে। মন্ত্রীবাবু, নেতাবাবুরা কেউ কিছু করছেন না। খালি দেখছি, হচ্ছে, হবে বলে কাটিয়ে দিচ্ছে।'

কুমারপুকুর গ্রাম। সত্যিই 'এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার/ লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।' এখানে মানুষ মরছে; না খেতে পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। বাদিয়া মুণ্ডার হিসাব অনুযায়ী গত দু-মাসে অন্তত দু-জন মারা গেছেন অনাহারে। এই গ্রামের জনসংখ্যা ৫৯২। বেশিরভাগই মুণ্ডা জনগোষ্ঠীভুক্ত। এখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায় নি। পাকা রাস্তা নেই। জমির আলই মূলত চলার পথ। আদিবাসী পরিবারগুলি ভূমিহীন।

ভূমিহীনদের জন্য খাসজমির পাট্টা বিলির কথা এলেও তা এখনও চোখে দেখতে পান নি কুমারপুকুর গ্রামের মানুষেরা। মূলত মাটির ঘরবাড়ি, প্রায় ভেঙে পড়ছে, হেলে পড়ছে। রোদ এসে পুড়িয়ে দেয়, বৃষ্টি এসে ভাসিয়ে দেয়, শীত এসে কাঁপিয়ে দেয়। তার ওপর রোজ ভাত-রুটি জোগাড় হয় না। শাপলা-শালুক খেয়ে কাটাতে হয়। বর্ষায় শামুক-গেঁড়ি-গুগলি ভরসা। যে দিন তাও জোটে না, শাকপাতা সেদ্ধ আর জল খেয়ে থাকতে হয়।

এইভাবেই তাঁরা বেঁচে আছেন, হয়তো থাকবেনও। নিজের চোখে সব দেখেশুনে বারুইপুরের মহকুমা শাসক বলেই ফেলেছেন : 'মানুষ যে কী প্রচণ্ড অসহায়, কত কষ্টে বেঁচে আছেন, চোখে না দেখলে বোঝানো অসম্ভব। না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই, না খাবারের সংস্থান; বেশিরভাগ দিনই তাঁরা অর্ধাহারে কাটাচ্ছেন।' (সূত্র : *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩০ এপ্রিল, ২০০৫)

আমলাশোলের মতো এ-ক্ষেত্রেও সিপিআইএম নেতা-মন্ত্রীরা 'মিথ্যা', 'অপপ্রচার', 'বাজারি কাগজের চক্রান্ত' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রতারণায় মেতে ওঠেন। অথচ এই মন্ত্রী-নেতারাই তো সকলের চেয়ে ভালো জানেন যে, কুমারপুকুর গ্রামের মুণ্ডা জনজাতিদের জীবিকা মূলত দিন-মজুরি। ভাগে চাষ করেন কেউ কেউ। সপ্তাহে গড়ে দু-তিন দিন কাজ জোটে। তাও সারা বছর নয়। আট ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে মেলে ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ভাগে চাষ করে খুব বেশি হলে বছরে মেলে ৬৪০ কিলো ধান, যা থেকে পাওয়া যায় মোট ৪০০ কিলো চাল। চারজনের পরিবারে দু-বেলা ভাত খেতে লাগে কমপক্ষে ২ কিলো ৪০০ গ্রাম চাল। অর্থাৎ বছরে একটি পরিবারেরই লাগে ৮৭৬ কিলো চাল। তা জোগাড় হয় না বলেই অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হয় আদিবাসীদের। এই তথ্য সিপিআইএম-এর নেতা-মন্ত্রীরা জানেন; জানেন সরকারি আমলারাও। তবুও কেন এই আত্মপ্রতারণা? জবাব চাইব না আমরা?

বান্দোয়ানের পাগলদাস মহন্ত

দিনের পর দিন গুগলি, সজনে পাতা, এমনকী আমড়ু খেয়ে পেট ভরিয়েছেন। আমড়ুর বীজ গুঁড়ো করে ভেজে খেতে খেতেই পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের প্রৌঢ় পাগলদাস মহন্তের পেটের গণ্ডগোল দেখা দেয়। সে গণ্ডগোল আর দূর হয় নি। হবে কী করে? চিকিৎসার পয়সা কোথায়? অতএব পাগলদাস মারা গেলেন। বান্দোয়ানের সুপুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পারগোলা গ্রামের আরও অনেকেই অনাহারে, অর্ধাহারে এমনই অবধারিত মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন। সুপুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ টি আসনের ৬টি মহাজোট (বিজেপি-তৃণমূল-কংগ্রেস) ও ৬টি সিপিআইএম-এর দখলে। টসে জিতে বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধান ও সিপিআইএম উপপ্রধানের পদ আলোকিত করে আছেন। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, দু-পক্ষের কাজিয়ায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে।

পাগলদাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও বিজেপি আর সিপিআইএম কুৎসিত ঝগড়ায় মেতেছে। বিজেপি বলছে : পঞ্চায়েত প্রধান তাদের দলের লোক হওয়ায় রাজ্য সরকার সাহায্য-সহযোগিতা করছে না। বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করে নি রাজ্য সরকার। অন্যদিকে সিপিআইএম-এর সুপুড়ি লোকাল সেক্রেটারির দাবি : 'এ-গ্রামে সরকারি প্রকল্পের কাজ দারুণভাবে চলছে। অনাহারে মৃত্যুর খবরটা একেবারেই ভুয়ো। এখানে অনাহারের পরিস্থিতি নেই। বিজেপি-তৃণমূলীরা ভুল তথ্য দিয়ে রাজনীতি করছে।'

অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার সামান্য আগ্রহ নেই, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কোনো মানসিকতাই নেই, এমনকী নেই মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও। আছে শুধুই নিম্নমানের কাজিয়া। সেই সঙ্গে গায়ের জোরে বুঝিয়ে দেওয়া : বাম শাসনে অনাহারে মৃত্যু হতে পারে না।

পারগোলা গ্রামে অনাহারে মৃত্যুর ধারাবিবরণী দিতে আমলাশোলের কৈলাশ মুড়ার বা কুমারপুকুরের বাদিয়া মুণ্ডার মতো সিপিআইএম-এর কোনো কর্মী এগিয়ে আসেন নি। এখানে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন তৃণমূলী সদস্য নন্দলাল মাহাতো। তাঁর ভাষায়, 'পারগোলায় অনাহার পরিস্থিতি রয়েছে। গ্রামের কিছু যুবক পাগলাদাসের আবেদন নিয়ে আমার কাছে এলে, তার উপরে 'ঘটনা সত্য' লিখে তাঁদেরকে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে যেতে বলি।' (সূত্র : *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ জুন, ২০০৫।) সংবাদে প্রকাশ, তৃণমূল সদস্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান খুলারাম মাহাতো তৎক্ষণাৎ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে (বিডিও) ত্রাণ দেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু বিডিও মরণোন্মুখ পাগলাদাসের জন্য ত্রাণ নয়, ইংরেজিতে কয়েক লাইনের নোট পাঠান। নোটে লেখেন, 'দরখাস্তের প্রক্রিয়ায় ভুল ছিল। সরাসরি আমাকে আবেদন করলেই পারতেন। এর আগে অনেক শক্তসমর্থ লোকের হয়েও পঞ্চায়েত প্রধান সাহায্যের আবেদন করেন। তাই আমি বলি, সাহায্য নিতে নিজে আসতে হবে। যে-সব সাহায্যপ্রার্থীর ত্রাণের চাল বহন করার ক্ষমতা নেই, তাঁদের অনেককেই নগদ ৬০ টাকা সাহায্য দিয়েছি। কিন্তু আবেদনপত্র নিয়ে আসা যুবকেরা পাগলদাসের ব্যাপারে সবিস্তারে জানাতে পারেননি।' (সূত্র : *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ জুন, ২০০৫।)

জলঙ্গী : ভাঙন দুর্গতদের অনাহারে মৃত্যু

২০০৫-এর ২১ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীর দয়ারামপুর এলাকায় ভাঙন দুর্গত সর্বস্বান্ত আলিমুদ্দিন শেখ ও দু-তিন দিন পরে তাঁর স্ত্রী অনাহারে মারা গেলেন। সরকারি তরফের ধারাবাহিক অবহেলার দরুনই যে এই অনাহারে মৃত্যু, এ সত্য অবশ্য নিয়মমাফিকভাবে জেলা শাসক, ডোমকল মহকুমা শাসক এবং পঞ্চায়েত প্রধান

অস্বীকার করেছেন। শুধু ওই দু-জন নয় আরো অনেকেই মারা গেছেন। যেমন, ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারির গোড়ায় একইভাবে মারা গিয়েছেন জুনেরা বিবি। ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে পরাশপুরে মারা গিয়েছেন গহর মণ্ডল। সংবাদে প্রকাশ, ওই বছর জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনাহারে মৃতের সংখ্যা আট। একের পর এক ভাঙনে দুর্গত, নিরাশ্রয়, রুটি-রুজিহীন মানুষ মৃত্যু-কবলিত হচ্ছে। প্রশাসন, মন্ত্রী, পঞ্চায়েত সবাই নির্বিকার। কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে, মৃত্যু যে অনাহারে নয়, তা প্রমাণ করতেই সকলে ব্যস্ত। তাদের মিথ্যাচার ধরা পড়েছে জলঙ্গীর ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ড. আশিস ঘোষের বিবৃতিতে। বলিষ্ঠভাবে তিনি জানিয়েছেন : 'জুনেরা বিবির হাত-পা ফুলে গিয়েছিল।... খাদ্যের অভাবেই এই অসুখ হয়। উনি যখন হাসপাতালে আসেন তখন একেবারে শেষ পর্যায় চলছিল। তাই বাঁচানো গেল না ...।' (সূত্র : *গণদাবী*, ১১-১৬ মার্চ, ২০০৫।)

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, জলঙ্গী, দয়ারামপুর, টলটলি, পরাশপুর ইত্যাদি এলাকায় সর্বস্ব খুইয়ে ভাঙন দুর্গতরা নিরাশ্রয়, রুজিহীন ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। সংখ্যাটি অন্তত এক হাজার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নামে যে তৎপরতার কথা প্রচার করে থাকে তা যে কত শূন্যগর্ভ ও মিথ্যা— জনজীবনের এই মর্মান্তিক ছবির মিছিল তারই নির্মম প্রমাণ। ওই অঞ্চলে অনাহারে মৃত আলিমুদ্দিনের পরিবারের এক সদস্য অভিযোগ করেছেন : 'এই এলাকায় ভিক্ষাও অমিল, কারণ ভিক্ষাটা দেবে কে?' (সূত্র : *গণদাবী*, ১১-১৬ মার্চ, ২০০৫।)

কার্যত ভাঙন-এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছে। এমনকী রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ যারা করছে, তাদের খাদ্য ও মজুরি এখনও বকেয়া পড়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে, ওইসব এলাকায় দুই থেকে সাতবার পর্যন্ত ভাঙনে বিধ্বস্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ আজ ছিন্নমূল। গত ২০০৪-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে কান্দি মহকুমা যখন বন্যায় ভাসছে, মানুষ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের অভাবে যখন রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নীচে বসে আছেন, তখন জলঙ্গীতে শুধু ভাঙনেই ৩৫০টি পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। পরিবার পিছু মাথা গোঁজার একটা ত্রিপলও জোটে নি। কিছু পরিবার উঠেছিলেন প্রাথমিক স্কুলে, পরে তাদের সেখান থেকেও বের করে দেওয়া হয়। জেলা শাসককে জানানো সত্ত্বেও ওই অবস্থার কোনো প্রতিকার হয় নি। পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা সরকার করে নি। এই মুহূর্তে গৃহহারা মানুষজন নিজেদের উদ্যোগেই গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে কোনোমতে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করে নিচ্ছেন কিংবা গাছতলাকেই ঘরবাড়ি হিসাবে ব্যবহার করছেন। কেউ কেউ অন্য গ্রামে আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে যথেষ্ট শিউরে ওঠার মতো পরিস্থিতিই বটে।

কয়েকটি প্রসঙ্গ-কথা

এদেশে অনাহারে মৃত্যু কোনো ঘটনা নয়। আর নতুন তো নয়ই। সুতরাং শাসকগোষ্ঠীর তরফে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা আড়াল করার মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য নেই। ওড়িশার কালাহান্ডি তো অনাহারে মৃত্যুর সর্বভারতীয় প্রতীক হিসেবে বর্তমান। প্রতিটি রাজ্যেই পিছিয়ে থাকা, অনগ্রসর এলাকায় অনাহার বা অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে। কটা মৃত্যুর খবরই বা প্রকাশ হয়? মহা-প্রাচুর্য্যের মধ্যে অতিকায় দারিদ্র্যের এই উপস্থিতি আমাদের দেশ, সমাজ ও সরকারের আর্থিক নীতির দেউলিয়াপনাকেই তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়!

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজও মানুষ অনাহার অপুষ্টি অথবা দারিদ্র্যের কারণে মারা যাবেন কেন? খাদ্যের দাবি তো মানুষের অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। খাদ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের তথা সরকারের।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদন নিয়ে কত গর্ব, কত কানফাটানো প্রচার। তবুও আমলাশোল, কুমারপুকুর, জলঙ্গীর মতো ঘটনা ঘটছে কেন? কেন এই হীন রাজনীতির নির্মম চাপান-উতোর? উনষাট কিংবা ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনে আন্দোলিত বামেদের তিরিশ বছরের জমানায় যখন আমলাশোল, জলঙ্গী, কুমারপুকুর ঘটে তখন সেদিনের সেই বাম নেতাদের আজকের শরীরী ভাষায় বিন্দুমাত্র লজ্জার চিহ্নই বা দেখা যায় না কেন?

চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যুর ধারাবিবরণী

এ-রাজ্যের চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যুর তথ্য ঘাঁটতে গিয়ে শরীর হিম হয়ে যাওয়ার অবস্থা। বাম সরকারের 'শিল্পায়নের ধারায়' এ কোন্ ছায়াপাত? রাজ্যের বিভিন্ন চা-বাগানে ধারাবাহিক মৃত্যুর মিছিল। সমগ্র ডুয়ার্সে অনাহার আর অর্ধাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন চা-বাগানের শ্রমিক ও পরিবারের লোকজন। এক-আধজন নয়, বেশ কয়েকজন।

দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সিইসি ও কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন ইউটিইউসি-র এক যৌথ অনুসন্ধানকারী টিমের প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ঢেকলাপাড়া, কাঁঠালগুড়ি, মুজনাই, রামঝোরা — এই চারটি চা-বাগিচায় মার্চ ২০০২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত ২৪০ জন মানুষ মারা গেছে অর্ধাহারে, অনাহারে, অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে। ২০০৩-এর মার্চ থেকে অক্টোবর, ২০০৫ মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও, আনুপাতিক হার যদি মোটামুটি একই থাকে (অন্তত পরিস্থিতি যেমনভাবে এগোচ্ছে, তাতে অন্য সম্ভাবনার কথা কোনোভাবেই ধারণা করা যাচ্ছে না) তাহলে হলফ করে বলা যায় যে, সংখ্যাটি হাজার ছুঁয়ে ফেলেছে।

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ছবি

১. ঊষা ছেত্রী। বয়স ২৮। চার সন্তানের জননী। ডুয়ার্সের বীরপাড়া থানা এলাকার ঢেকলাপাড়া চা বাগিচার মহিলা শ্রমিক। ২০০২-এর ২১ আগস্ট থেকে মালিক বাগানে তালা ঝুলিয়ে পালিয়েছে। তারপর থেকে ওই বাগানের শ্রমিকদের জীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন দুর্দশা। ঊষা ছেত্রী ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি চরম দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ২০০৩-এর ৩ ডিসেম্বর আত্মঘাতী হন। আর সেই সময়ের মধ্যে ওই চা-বাগানে মৃতের সংখ্যা ৭৫।

২. মানসী টুডু। বয়স ১৫। বর্তমানে অনাথ। জলপাইগুড়ির রামঝোরা চা-বাগানে কাজ করতেন মানসীর বাবা-মা, অনাহারে-অপুষ্টিতে দু-জনেই মারা গেছেন। মানসী এখন তিন বাড়িতে বাসনমাজা, ঘর সাফাইয়ের কাজ করে। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে তার বেঁচে থাকার চেষ্টা। তার একমাত্র সঙ্গী এখন আট বছরের ছোটো ভাই। উল্লেখ্য, রামঝোরা চা-বাগানের স্বাস্থ্য-সহায়ক সমীর বিশ্বাসের হিসেব অনুযায়ী, মানসীর বাবা-মাকে ধরে ২০০৩-এর নভেম্বর পর্যন্ত রামঝোরা চা বাগানে মৃতের সংখ্যা ৮৫।

৩. ২০০২-এর ২২ অক্টোবর। কালচিনি ব্লকের রায়মাটাং চা-বাগানে আন্ত্রিক ছড়িয়ে পড়ে। অখাদ্য-কুখাদ্য ও উপযুক্ত পানীয়ের অভাবে শয়ে শয়ে চা-শ্রমিক পরিবারের লোক আক্রান্ত হলো। দ্রুত তা মহামারীর আকার নেয়। মাত্র ৫ দিনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ৪ শিশু-সহ মোট ১০ জন। (সূত্র : এআইসিসিটিইউ।)

এরকম অসংখ্য টুকরো টুকরো মর্মান্তিক, শিউরে-ওঠা ছবি এখন হামেশাই দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ, বিশেষত ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ চা-বাগান অঞ্চলে। মহামান্য বাম সরকার ও তার স্বাস্থ্য দপ্তর পোশাকি কারণ যাই দেখাক না কেন, এই মৃত্যু মিছিলের প্রধান ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র কারণ হলো অনাহার। উন্নততর বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলছেন : 'রাজ্যের কোনো চা-বাগানে অনাহারে একজনেরও মৃত্যু হয় নি। যারা মারা গেছেন তারা সবাই হয় আন্ত্রিকে নতুবা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আমরা শুধু এই প্রশ্নটিই করতে পারি : তাদের জন্যে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কী? মুখ্যমন্ত্রী কী শুনতে পাচ্ছেন?

আসল ঘটনা হচ্ছে, ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বন্ধ হয়ে আছে সারি সারি চা-বাগান। কাঁঠালগুড়ি, রহিমাবাদ, রামঝোরা, মুজনাই, ঢেকলাপাড়া, শ্রীনাথ পুর, কোহিনুর, ধওলাঝোরা, সামসিং, চামুর্চি, বামনডাঙা, টুন্ডু — এক সময়ে রমরমিয়ে চলা এই সব কটি চা বাগান এখন বন্ধ, পরিত্যক্ত। একদা সুন্দর, সাজানো এই সব বাগিচা এখন যেন প্রেতপুরী। বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণটুকু নেই। পানীয় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, চিকিৎসা নেই। বাগান বন্ধ হয়ে গেলেও কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য

অত্যাবশ্যক পরিসেবা চালু রাখতে হবে — এমন কোনো আইনও নেই! এআইসিসিটিইউ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাঁঠালগুড়ি চা-বাগানে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫০০। এর মধ্যে ২০০ শিশু অন্ধ হতে চলেছে ভিটামিন-এ-র অভাবে। বন্ধ বাগানগুলির প্রায় ৫ হাজার শিশুর মধ্যে ২ হাজার শিশু ভিটামিন-এ যুক্ত খাবার না পেলে আর কয়েক মাসের মধ্যে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাবে বলেও ওই প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয়েছে।

দুটি চিঠি : অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর প্রামাণ্য দলিল

১. রহিমাবাদ চা বাগানের জনৈক ক্লেমেন্ট ডুংডুং ও এইচ পি গোপাল স্বাক্ষরিত আলোচ্য চিঠিটি ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আলিপুরদুয়ারের 'নেচার ক্লাব'-এর সদস্যদের হাতে পৌঁছোয়। রাজ্যের মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর 'পশ্চিমবঙ্গে অনাহার মৃত্যু' শীর্ষক প্রতিবেদনে চিঠিটি প্রকাশ করা হয়।

'মহাশয়,
আপনাদের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, রহিমাবাদ চা বাগান গত (ইং) ১৭-০৪-২০০২ থেকে মালিকপক্ষ বন্ধ করে রেখেছে। আমাদের বাগানে ৭০০ (সাত শত) শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার সহ প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) কাছাকাছি লোক দীর্ঘদিন ধরে অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করছে এবং এই বাগানের প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মালিকপক্ষ খেলা করছে। আমরা খুবই অসহায় অবস্থায় আছি। আমাদের কাছে পানীয় জল নেই, খাদ্যসামগ্রী নেই, এবং কোনো রোগ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। বাগান বন্ধ হওয়ার পর থেকে ১৪০ জনের মতো লোক বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে, তার মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি। অতএব মহাশয়ের নিকট আমাদের করজোড়ে প্রার্থনা যে, আপনাদের সংস্থা থেকে যতটুক সামর্থ্য হয় আমাদের সাহায্য দিয়ে উপকারিত করবেন এবং আপনাদের উপকার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

২. রহিমাবাদ চা-বাগিচার মালিকের কাছে লেখা জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ারের মহকুমা শাসকের চিঠিটির তারিখ ৮ নভেম্বর ২০০২। এআইসিসিটিইউ প্রকাশিত চিঠিটি এইরকম :

'আলিপুর দুয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ মেডিকাল অফিসার অফ হেলথ-এর হিসাব অনুযায়ী ১৭-০৪-০২ (অর্থাৎ যেদিন থেকে বাগান বন্ধ হয়েছে) থেকে ১১-১০-০২ পর্যন্ত ১ থেকে ৭৫ বছর বয়সের বাইশ জন মানুষ মারা গেছে অপুষ্টির (আন্ডার নিউট্রিশন) কারণে। ... স্বাস্থ্য অধিকর্তারা অপুষ্টিজনিত

কারণকেই মৃত্যুর প্রধানতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। আপনার বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষিত হওয়ার ফলে ন্যূনতম 'খাদ্য' সংগ্রহ করা যায়নি। এর থেকেই যে 'অপুষ্টি', তাকে 'অনাহার' হিসাবেই বিবেচনা করা যেতে পারে।। আর, আজকালকার আধুনিক সমাজে অনাহারে মৃত্যু হত্যার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।'

মৃত্যুর এই মিছিল কী অনিবার্য?

২০০১ থেকে ২০০৪-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডুয়ার্সের প্রায় ৩০টি চা-বাগিচা বন্ধ হয়ে গেছে। মালিকপক্ষ বলছে, বিশ্ব বাজারে ভারতীয় চা-এর চাহিদা দারুণভাবে কমে গেছে। এক সময় ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ভারতের চায়ের মূল ক্রেতা। সেই সোভিয়েত ভেঙে যাওয়া, পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চায়ের বাজারে মন্দা নেমে এসেছে। অতএব ...। তাই যদি হয়, তাহলে বৃহৎ শিল্পীয় ঘরানা বা বহুজাতিক সংস্থার পরিচালনাধীন চা-বাগানগুলি বন্ধ হচ্ছে না কেন? টাটা, কিনলে, গুডরিক, ডানকানস, উইলিয়ামস মেগর ইত্যাদি বৃহৎ একচেটিয়া সংস্থার চা-বাগানগুলি এই 'মন্দার বাজারে'ও রমরমিয়ে চলছে কীভাবে? চা শিল্পে এই 'সংকট সত্ত্বেও পেপসির মতো বহুজাতিক সংস্থা 'জর্জিয়া' নাম নিয়ে, চা-কে বাক্সবন্দি করে বাজার গ্রাস করতে দোকানে দোকানে তার অস্তিত্ব জাহির করছে কী করে? এর থেকে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প 'সংকটে' আবর্তে, নেহাতই এক আষাঢ়ে গল্প। অন্তত যখন দেখা যাচ্ছে যে, এ-দেশের চা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে তার কোনো ছোঁয়া লাগে নি। বহু প্রচারিত 'সংকট'-এর বাজারে চা কোম্পানিগুলির শেয়ারের দামও তো আদৌ কমে নি। তাহলে?

আসলে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানে কেউ বিনিয়োগ করছে না। অল্পদিনের ব্যবধানে অতি-মুনাফার লক্ষ্য নিয়েই বাগান চালাচ্ছে মালিকেরা। মধ্যস্বত্বভোগীদের চূড়ান্ত বাড়-বাড়ন্তর এই দিনে স্বল্প বিনিয়োগে ও স্বল্প সময়ে চটজলদি মোটা মুনাফা অর্জনের প্রয়াস এখন সবার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। একটি চা গাছের নির্দিষ্ট একটা আয়ু আছে। সারা জীবন একটা চা গাছ থেকে একই মানের পাতা একই পরিমাণে পাওয়া অসম্ভব। চা গাছের চল্লিশ বছরের আয়ুষ্কালের পর তাই নতুন চা গাছ লাগানো অত্যন্ত জরুরি। জরুরি বাগিচার অন্যান্য খাতের যে-খরচটা মালিকেরা কাগজে কলমে উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে জুড়ে দেয় (বাস্তবে যার থেকে কাজের কাজ কিছুই হয় না) তাকে ঠিক মতো কাজে লাগানো।

'দি প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট ১৯৫১' ও 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার প্ল্যান্টেশন রুলস ১৯৫৬' অনুযায়ী শ্রমিকদের যে যে সুবিধা প্রদেয়, তার অনেকটাই মালিকেরা দেয় না। এখন বাকিটুকুও তাদের কাছে বোঝা বলে মনে হচ্ছে। কারণ শুধু পাতা

তোলার বাগান বা শুধু টি প্রসেসিং-এর কারখানা অর্থাৎ 'বট লিফ ফ্যাক্টরি' চালানো অনেক সুবিধাজনক। কারণ ওপরে উল্লিখিত আইন সেখানে কার্যকর নয়।

১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল :

১৯৯৮ — ১৯৭.৮৭০ মিলিয়ন কেজি ; ১৯৯৯ — ১৮০.২১ মিলিয়ন কেজি;
২০০০ — ১৮০.৭২৪ মিলিয়ন কেজি ; ২০০১ — ১৯০.৬৮৯ মিলিয়ন কেজি;

চা পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে চা-বাগানের সংখ্যা ছিল ১৫৫০টি। এর মধ্যে বড়ো বাগানের সংখ্যা ৩৪৩টি, বাকিগুলি ছোটো বাগিচা। সাধারণভাবেও রাজ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সিংহভাগই আসছে কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে। ১৯৯৭-৯৮ থেকে ১৯৯৯-২০০০ এই তিন বছরে এই হিসাব উলটে নিয়ে হয়েছে যথাক্রমে ৭.৪৬ শতাংশ ও ৮.৩৮ শতাংশ, ৭.৪২ শতাংশ ও ৮.৬৬ শতাংশ এবং ৭.৪৬ শতাংশ ও ৯.০১ শতাংশ। চা শিল্পেও ওই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের ২০০২-০৩ সালের আর্থিক সমীক্ষা অনুসারে ছোটো চা উৎপাদকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ও সর্বভারতীয় চা উৎপাদনে এদের অংশ ১৯৯১ সালে ৬.৯২ শতাংশ থেকে ২০০১ সালে ১৯.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চা শিল্পের এই ব্যাপক 'বি-সংগঠিতকরণ'-এর প্রক্রিয়া এই শিল্পের সংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। ছোটো উৎপাদকেরা কম উৎপাদন খরচে চা বেচতে পারে ও তাদের চায়ের দাম বড়ো উৎপাদকের চাইতে তুলনায় কম। ফলে, বড় কারখানাগুলিতে সংকট তৈরি হচ্ছে। বড়ো কারখানার মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রে বকলমে ছোটো উৎপাদকের ভূমিকা নিচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠছে ছোটো অ-নথিভুক্ত কারখানা, চলছে ফাটকা উৎপাদন। এইসব কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ২০-র কম, তাই সরকারি নিয়ম-নীতিও লাগু হচ্ছে না। এরা চা চাষের জন্য লিজেও জমি নিচ্ছে বা চুক্তির ভিত্তিতে ছোটো চাষিদের দিয়ে চা চাষ করাচ্ছে। এক শ্রেণির ফাটকা উৎপাদক ছোটো ছোটো বাগান থেকে কম দামে সবুজ পাতা কিনে নিজেদের কারখানায় ব্যবহারযোগ্য চায়ে রূপান্তরিত করে তা সরাসরি বিক্রি করছে খোলাবাজারে। বাগানহীন এইসব ফড়ে ব্যবসায়ীদের পাতা স্বাভাবিকভাবে বাজারে বিক্রিও হচ্ছে কম দামে। অন্যদিকে সরকারি নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উৎপাদিত চায়ের ৭৫-৮০ শতাংশই বিক্রি হচ্ছে খোলাবাজারে এবং মাত্র ২৫-৩০ শতাংশ বিক্রি হচ্ছে নিলামের মাধ্যমে।

উদারীকরণের নামে সারা বিশ্বজুড়ে ফাটকা কারবারের রমরমা ছাপ ফেলেছে রাজ্যের চা শিল্পের ওপরও। বেসরকারি মালিকেরা চা বাগানের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও তার আধুনিকীকরণ করতে নতুন বিনিয়োগে কোনো উৎসাহ দেখায় নি। তাদের নজর মূলত ফাটকা কারবারের দিকে। ৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো চা গাছের সংখ্যা

এ-রাজ্যে ৪৪ শতাংশ। এগুলোর প্রতিস্থাপন ঘটাতে নতুন বিনিয়োগ দরকার। এর অভাবে বহু বড়ো বাগান রুগ্ন হয়ে পড়ছে। রুগ্ন বাগানে শ্রমিক ও মজুরি ছাঁটাই করে মুনাফা ধরে রাখতে চাইছে বেসরকারি মালিকেরা। কোথাও কোথাও কারখানা বন্ধ করে দিয়ে জমিজমা সম্পত্তি বেচারও চক্রান্ত চলছে কিংবা বেচা হয়ে গেছে। যেমন চাঁদমণি চা বাগান।

চা শিল্পের এই 'সংকট'-এর প্রধান শিকার চা শ্রমিকেরা। একদিকে চলছে বন্ধ কারখানায় ব্যাপক ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া ও অন্যদিকে জমছে বকেয়া মজুরি ও অন্যান্য প্রাপ্যের পাহাড়। আইনি বা বেআইনি উভয় পথেই শিল্পের আয়ে মজুরির অংশ দ্রুত কমছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ছোটো ছোটো অসংগঠিত এই সব কারখানায় সরকারি আইনকানুন মানার তাগিদ বা বাধ্যবাধকতা নেই। এবং সম্ভবত কোনো শ্রমিক ইউনিয়নও নেই। তাই অনেক কম মজুরিতে ওই সব কারখানার মজুরদের কাজে লাগানো হচ্ছে।

আর এসবই ঘটছে বাম সরকারের চোখের সামনে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে। চা উৎপাদন ও ব্যবসায় যে অসংখ্য ফাটকা কারবারীরা যুক্ত তারা কোনো না কোনো শাসকদলের আশীর্বাদধন্য ও দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

সামগ্রিক পরিস্থিতি

বামফ্রন্ট সরকারের বহু বিজ্ঞাপিত সংবেদশীলতা আজ আক্ষরিক অর্থেই পরিহাস। সব মিলিয়ে চল্লিশ হাজারেরও বেশি চা-বাগান শ্রমিক অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। আফ্রিকার সোমালিয়া বা ওড়িশার কালাহাণ্ডির সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে ডুয়ার্সের চা-বাগিচা অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেখানে অধিকাংশ শ্রমিকের যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই। তাঁদের স্বভূমি বলে এখন আর কিছু নেই। বাগান বন্ধ হওয়ার পর লাইন উজাড় করে তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন বা দিচ্ছেন ভুটানে, অসমে, বিহারে রাজস্থানে— পাথর খাদানে, ইটভাটায়, সিমেন্ট কারখানায়। যেখানে পেরেছেন সেখানে। আর সেখানকার মালিকেরাও এর সুযোগ নিয়েছে বা নিচ্ছে। এবং প্রায় ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে কোণঠাসা মানুষগুলিকে। তারপরেও যাঁরা টিকে থাকছেন, তাঁরা অতি কষ্টে হয়তো দুবেলা দু মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারছেন। কিন্তু যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁরা? মৃত্যুর মিছিলে ভিড় বাড়ানো ছাড়া তাঁদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। রায়মাটাং, কালচিনি, ডিমা, রহিমাবাদ, কোহিনুর, এই সবকটি বাগান থেকে কাতর আহ্বান আসছে ত্রাণের — খাদ্যের, শীতবস্ত্রের, ওষুধের। এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানী দল রায়মাটাং চা-বাগানের এক কম্পাউন্ডারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানান, শ্রমিক লাইনে অন্তত কয়েকশো মানুষ মূলত সঠিক

খাদ্যাভাবে টিবি রোগ নিয়ে ঘুরছেন। অখাদ্য বস্তু খেয়ে খিদে মেটানোর চেষ্টার ফলে দেখা দিচ্ছে ভয়াবহ আন্ত্রিক।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে পরে পুরিষ্ট থাকবে আর নীচের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত।... এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।' আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে অনাহারে মৃত্যুর প্রশ্নে যখন নির্বিকার-উদাসীন থাকেন, তখন ধরেই নেওয়া হয় যে তাঁরাও আসলে 'অসাড়তার ব্যামো'-তে কাহিল। তাই তাঁর সরকার কত অনায়াসেই দায় এড়িয়ে চলেন। কিন্তু বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষ কী পারে দায় এড়াতে? না, পারে না। কারণ, মানুষের যত অধিকার রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম হলো ঠিকমতো খেতে পাওয়ার অধিকার। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের শ্রমিকরা সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত। কিন্তু সত্যিই কী কিছুই করার নেই? তাই কি তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক, ধওলা, সংকোশের রূপসী ডুয়ার্স, সিঞ্চুলা পাহাড়ের অপরূপ নিসর্গের ডুয়ার্সের বাইরে আজ নতুন একটা 'কুৎসিত-অন্ধকার' ডুয়ার্স ক্রমশ জেগে উঠছে, যেখানে মানুষের মতো বাঁচার অধিকারটুকুও আজ আর অবশিষ্ট নেই?

প রি শি ষ্ট : ১

উনষাটের খাদ্য আন্দোলনের পটভূমি

এ-রাজ্যে ১৯৫৯-এ যে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল, তার ঝাঁঝ ১৯৬৬-র মতো অত তীব্র কিংবা ব্যাপক ছিল না। কিন্তু সেখানেও কাজ করেছে রাষ্ট্রচরিত্রের চিরাচরিত মানসিকতা। সেই সময়ে বিধান রায় সরকারও একইভাবে নির্মমতা-বর্বরতাকেই হাতিয়ার করেছিল।

১৯৫৯-এর আন্দোলনের সময়ও কলকাতার বুকে ঘটেছিল পুলিশি নির্দয়তার নানা শিউরে-ওঠা ঘটনা। যেমন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ খাদ্যের দাবিতে কলকাতা ময়দানে এক বিশাল জমায়েত হয়। সভা শেষে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে একাধিক মিছিল শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে। একটা মিছিল রাইটার্সের দিকে পা বাড়াতেই পুলিশ তাদের পেটাতে শুরু করে। গ্রামের কৃষক এসেছে কলকাতা শহরে। পালাবার পথঘাটও তারা জানে না। শুধু মুখ বুজে পড়ে পড়ে তারা মার খেল এবং নারী-পুরুষ মিলে সম্ভবত ৮০ জনকে খুন করল কংগ্রেসি সরকারের পুলিশ বাহিনী। না, এদের মারা হল বন্দুকের গুলিতে নয়, শুধু লাঠি দিয়ে থেঁৎলে থেঁৎলেই এদের মারা হল .....।' (*সেদিনের কথা*, মণিকুন্তলা সেন)।

১৯৫৯-এর ১ জানুয়ারি থেকে সরকারের নির্দিষ্ট দর চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে যায়। কলকাতা সহ বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে সরকারের নির্দিষ্ট দরের থেকে অনেক বেশি দরে সাধারণ মানুষকে চাল কিনতে হচ্ছিল। মুনাফাখোররা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিরোধী নেতারা (মূলত বামপন্থী) তৎকালীন বিধান পরিষদ ও বিধান সভায় হইচই শুরু করেন। জনগণের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। খাদ্যনীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে সরকার ব্যর্থ — এই মর্মে একগুচ্ছ মূলতুবি প্রস্তাব আনেন। সরকারি মন্ত্রী, বিধায়কদের সঙ্গে তুমুল বাদ-বিতন্ডা করেন। ওদিকে কতিপয় প্রভাবশালী লোকের মদতে চাল নিয়ে চোরা কারবার চলছে রমরমিয়ে। ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৯ কলকাতার এক নামী দৈনিকে ছাপা হলো : 'কলিকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অফিসারগণ গত ১লা জানুয়ারি রাত্রে উত্তর কলিকাতায় শোভাবাজার স্ট্রিটের একটি গুদাম হইতে কাঁকর মিশ্রিত প্রচুর চাউল ও প্রচুর পরিমাণ কাঁকর উদ্ধার করেন। পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, এনফোর্সমেন্ট বিভাগের পুলিশ কোনো মহল হইতে সংবাদ পাইয়া উপরোক্ত গুদামে হানা দিয়া কাঁকর-মিশ্রিত প্রায় ২,২০০ মণ চাউল, প্রায় ১০ মণ কাঁকর ভর্তি বস্তা ও কাঁকর-মিশ্রিত ২২ মণ খুদ

উদ্ধার করে। তা ছাড়া চাউলের সহিত কাঁকর মিশানো হইতেছে, এইরূপ অবস্থায় ১৬২ মণ চাউল ভর্তি ৮১টি বস্তা উদ্ধার করা হয় .....।'

সে সময় চালের বাজার সম্পর্কে দৈনিক সংবাদপত্রে আরও একটি রিপোর্ট : 'ধান-চাউলের সরকার নির্ধারিত মূল্য প্রবর্তিত হওয়ার দ্বিতীয় দিনে (২.১.১৯৫৯) চাউলের খুচরা বাজার আরও স্তিমিত হইয়া পড়ে ও খরিদ্দারদের মধ্যে উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দৃষ্টির সম্মুখে আড়তদারদের যেসব গুদামে বস্তার সারি দেখা যাইত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওইগুলি এখন খালি। এইদিন বাজারে ক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতাদের দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে শোনা যায় যে, অন্ততঃ কিছু সংখ্যক পাইকার ও আড়তদার পুরাতন চাউল তো লোকসানের ভয়ে হাতছাড়া করিতেছেন না, নতুন চাউলও আমদানি করিতেছে না। ফলে খুচরা বিক্রেতা তথা উহাদের খরিদ্দার গণ রীতিমত ফাঁপরে পড়িয়াছেন।'

সে সময়ের পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে 'মুনাফা নিরোধ আইন' আনতে চেয়েছিল। আইনের মূল কথা ছিল : সরকারের নির্দিষ্ট দরের থেকে বেশি দামে চাল বিক্রি করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। আইন লঙ্ঘনকারীকে দণ্ডস্বরূপ দু-বছর কারাদণ্ড অথবা জরিমানা করা হবে। এই আইনকে তৎকালীন কংগ্রেসী খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন 'খাদ্যে পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করার পথে সরকারের অগ্রগতি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত 'মুনাফাখোর' ও বিরোধী দলগুলির (মূলত বামপন্থী) চাপে 'মুনাফা নিরোধ আইন' শেষপর্যন্ত আনা হয় নি। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সম্পর্কে বামপন্থী নেতা স্নেহাংশু আচার্য-এর অভিমত ছিল : 'আমাদের খাদ্যমন্ত্রী যা কিছুই স্পর্শ করেছেন কেরোসিন, কাপড় অথবা চাল — সব কিছুতেই তিনি সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। তাঁর হাতে মৃত্যুর স্পর্শ.....।'

পরিশিষ্ট : ২

'রেশন বিদ্রোহে'র দিনলিপি

৮ অক্টোবর ২০০৭

মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার পাঁচগ্রামের ভাঙাপাড়ায় মইনুদ্দিন মন্ডল নামে এক ডিলারের বাড়ির সামনে এসে জড়ো হন লাগায়ো খোড়াদিঘি মোল্লাপাড়া, বলাশপুর ও ভাঙাপাড়ার মানুষ। অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর প্রাপ্য রেশন পাচ্ছেন না। জনতার রুদ্রমূর্তি দেখে রেশন ডিলার বকেয়া গমের দাম বাবদ পরিবার পিছু ২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কোর্ট পেপারে এই মর্মে মুচলেকাও দেয়। কিন্তু টাকা দেওয়ার আগেই নবগ্রাম থানার এক সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ডিলারের বাড়িতে আসে। সেই সময়ে জানাজানি হয়ে যায়, পুলিশ ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে ডিলারকে বাঁচাতে এসেছে। নিমেষে শুরু হয়ে যায় ইট বৃষ্টি। পুলিশও পাল্টা লাঠি চালায়। জনতার একাংশ ডিলারের বাড়ি ঢুকে ভাঙচুর চালাতে থাকেন। বাইরের জনতা পুলিশের ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেন। খবর পেয়ে আরও দুটি জিপ ও একটি ভ্যান বোঝাই পুলিশ আসতেই সেই মুহূর্তে অকুতোভয় জনতা পুলিশবাহিনীকে ঘিরে ধরেন। পুলিশ শূন্যে গুলি চালায়। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের তিনটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেন। এবার মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসক বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনা স্থলে আসে। জনতা পিছু হটেন। তারপর পুলিশ সারাদিন তল্লাশির নামে গ্রামে তাণ্ডব চালায়। লাঠি পেটা ছাড়াও নির্বিচারে গ্রেপ্তার শুরু করে। মোট ৩২ জনকে থানায় চালান করা হয়।

৭-৮ অক্টোবর ২০০৭

পুলিশ নিয়ে হামলা করবে সিপিআইএম, এই আশঙ্কায় বর্ধমানের দিঘিরপারের মানুষ 'ব্যারিকেড' গড়লেন। ৭ অক্টোবর, ২০০৭ ওই গ্রামে ও তার লাগোয়া নবাবহাট এলাকায় রেশন দুর্নীতির অভিযোগে জনতা বেদম প্রহার করেন সিপিআইএম বিধায়ক-সহ দলের জেলান্তরের নেতাদের। ভাঙচুর চালান সিপিআইএম দপ্তরে। পাল্টা সিপিআইএম-এর সমর্থকরা অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে। এদিকে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সিপিআইএম-এর লোকজনই তাদের নেতাদের পিটিয়েছে। তারপর তারাই আবার অস্ত্র নিয়ে মিছিল করছে। পুলিশ দিয়ে গাঁ-ছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে। তাই ৮ অক্টোবর দিঘিরপারের মানুষ গোরুর গাড়ি, তালগাছের গুঁড়ি, ইট-পাথর দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেন যাতে পার্টির নেতা-সমর্থকরা গাঁয়ে ঢুকতে না পারে।

৯ অক্টোবর ২০০৭

অনন্তপুর গ্রামের রেশন ডিলার হাজি কুদ্দুসকে বাঁচাতে অস্ত্র ধরলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা নবগ্রাম জোনাল কমিটির সম্পাদক সুনীল ঘোষ ও তার সহচররা। ঘটনায় প্রকাশ ওই দিন সকালে স্থানীয় আনন্দপুর গ্রামের ওই রেশন ডিলারের কাছে হিসাব নিতে আসছিলেন কয়েকশো গ্রামবাসী। হঠাৎ তাঁরা দেখেন গ্রামের মাঠে সুনীল ঘোষ-সহ কয়েকজন বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের প্রকাশ্য ঘোষণা : সন্ত্রাস রুখতেই এই সশস্ত্র প্রতিরোধ। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন জেলায় রেশন ডিলারের দোকান ও বাড়িতে জনতার হামলায় ভীত-সন্ত্রস্ত সিপিআইএম-এর নেতা-ডিলাররা আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতি-আক্রমণ শুরু করে।

১১ অক্টোবর ২০০৭

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সিদ্ধেপাড়া গ্রামের (সমুদ্রগড় স্টেশন-সংলগ্ন) ডিলার রঞ্জিত সেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার বাড়িতে চড়াও হন ৪ হাজার মানুষ। রঞ্জিতের কাছে কার্ড পিছু ২ হাজার টাকা দাবি করা হয়। রঞ্জিত তা দিতে অস্বীকার করলে জনতা তার বাড়ি তছনছ করেন। পুলিশ এসে স্থানীয় এক যুবককে গ্রেপ্তার করলে ক্ষিপ্ত জনতা তাকে ছিনিয়ে নিতে যায়। বেধে যায় পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ। নির্বিচারে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও শূন্যে গুলি চালিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে পুলিশ।

১২ অক্টোবর ২০০৭

মালদার হবিবপুর থানার কেন্দুয়া গ্রামে রেশনে নায্য চাল-গম না পেয়ে বাড়ি ঘেরাও করে রেশন ডিলারকে মারধোর করেন গ্রামবাসীরা। ডিলারকে বাঁচাতে যায় বিডিও, খাদ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টর ও পুলিশ-বাহিনী। গ্রামবাসীরা তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান।

১৩ অক্টোবর ২০০৭

রেশন রোষ ছড়িয়ে পড়ল উত্তর ২৪ পরগণায়। নৈহাটির মাসুদপুর পঞ্চায়েতের কুলিয়াগড়ে উত্তেজিত গ্রামবাসী একটি রেশন দোকানে ঢুকে চাল ও গমের ৫৫টি বস্তা তুলে নিয়ে যান। বস্তাগুলি রাখা হয় স্থানীয় হরিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত ১১ বছর ধরে তাঁরা রেশনের মালপত্র পাচ্ছেন না। রেশন ডিলার সুনীল দাসের কাছে অসংখ্যবার আবেদন জানিয়েও কোনো ফল হয় নি। এবার গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে প্রাপ্য চাল-গম কেড়ে নিতে চাইছেন।

১৪ অক্টোবর ২০০৭

'রেশন বিদ্রোহে'র কেন্দ্র এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা। কাকদ্বীপ থানার জুমাইনস্কর গ্রামে রেশন ডিলারদের গুদামে গুদামে আক্রমণ চালালেন কয়েক হাজার মানুষ। পুলিশ বাধা দিলে জনতার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। পুলিশ দু-রাউন্ড গুলি চালায়। তার আগে নির্মমভাবে লাঠি চালায়। ওই ঘটনায় সিপিআইএম-এর মন্ত্রী কান্তি

গঙ্গোপাধ্যায়, সাংসদ সুজন চক্রবর্তী, কাকদ্বপের বিধায়ক অশোক গিরি ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিমল মিস্ত্রিকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

১৫ অক্টোবর ২০০৭

উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গার চাঁপাতলায় ওহিদুল ইসলাম নামে এক রেশন ডিলারের বাড়িতে এবং একটি ট্রেকারেও আগুন ধরিয়ে দেন কয়েকশো মানুষ। জনরোষের মোকাবিলায় বিশাল পুলিশ বাহিনী নামে। বেঁধে যায় সংঘর্ষ। ৪ জন পুলিশ সহ একাধিক গ্রামবাসী আহত হন। সংবাদে প্রকাশ, আগের দিনই অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর জনতা ওহিদুলের বাড়িতে চড়াও হয়ে মজুত ৪৮ বস্তা চাল সাধারণের মধ্যে ন্যায্য দামে বিতরণের দাবি জানান। ওহিদুল রাজিও হয়। কিন্তু পরের দিন (১৫ অক্টোবর) তার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, সব চাল উধাও আর বাড়িতে পুলিশি প্রহরা। ক্ষিপ্ত জনতা তখন ভাঙচুর চালাতে শুরু করেন। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে বিমান বসু জানান, বাম সরকারের সুষ্ঠু গণবন্টন ব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে তৃণমূলের উস্কানিতে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ এই ধরণের লুট পাট চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেগঙ্গার চাঁপাতলা ও আশপাশের গ্রামে তৃণমূলের লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে ।

১৬ অক্টোবর ২০০৭

রেশন নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুষ্কৃতীদের ঠেকাতে লাঠি, টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে দলীয় কর্মীদের 'আহ্বান' জানালেন সিপিআইএম-এর বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অমল হালদার। প্রকাশ্যসভায় দাঁড়িয়ে এই 'দায়িত্বশীল' নেতা গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে এহেন কথা বললেন, বাম নেতারা কলকাতায় বসে শুনলেন !

ওই একই দিনে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানার কালীরহাটে রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত গ্রামবাসীদের ওপর উন্মত্তের মতো এলোপাথাড়ি লাঠি চালায় পুলিশ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 'তল্লাশির নামে পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালায় এমনকী মহিলাদেরও মারধোর করে।' কালীরহাটের রেশন ডিলার দুলালচন্দ্র সাহা স্থানীয় সিপিআইএম-এর প্রভাবশালী নেতা। তাই জনসাধারণের ওপর পুলিশি পীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সংবাদ প্রকাশ, ওই ডিলার তথা নেতা দুলাল চাল-গম পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যার ফলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

১৭ অক্টোবর২০০৭

রেশন বিক্ষোভ অব্যাহত। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর, উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট, বাঁকুড়া-সহ কয়েকটি জায়গায় ডিলারদের ওপরে জনরোষ আছড়ে পড়েছে। এবার নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য প্রশাসন। রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি আটকাতে জেলা প্রশাসনকে নজরদারির কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। ব্লক থেকে জেলা পর্যন্ত তিনটি স্তরে এই কাজে খাদ্য দপ্তরের অধিকারিকদের সঙ্গে যুক্ত হবেন ব্লক আধিকারিক মহকুমা শাসক ও

জেলা শাসক। ১৭ অক্টোবর মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে এক বৈঠকের পরে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত এ কথা জানান। তাঁর কথায়, উন্নতভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে রেশন ব্যবস্থার কাজ পরিচালনা করার জন্যই নজরদারির কাজে জেলা প্রশাসনকে যুক্ত করা হলো। এরপর নেওয়া হবে দোকান-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা। এবং তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বৈঠক চলছে।

ওই ১৭ অক্টোবরেই, দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারকে মদত দেওয়ার অভিযোগে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সিপিআইএম সদস্য রামগোপাল আগরওয়ালের বাড়িতে ভাঙচুর চালাচ্ছেন প্রায় ৮০০ গ্রামবাসী। এছাড়াও, উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের বেগমপুর-বিবিপুর পঞ্চায়েতের বড়ো গোবরা গ্রামের রেশন ডিলার হরিদাস বিশ্বাসের বাড়িতে চড়াও হচ্ছেন শয়ে শয়ে মানুষ। অভিযোগ, গত ৪৪ সপ্তাহ ধরে এপিএল তালিকাভুক্তরা ওই এলাকায় রেশনের চাল-গম পাচ্ছেন না।

গত ১১ মাস ধরে রেশনের গম না দেওয়ার অভিযোগে এই দিন সকালে বাঁকুড়া সদর থানার কেঞ্জাকুড়া গ্রামে এক ডিলারের বাড়িতে জনতা আক্রমণ চালান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চন্দ্রশেখর কুচলান নামে ওই ডিলারকে উদ্ধার করে। 'হামলা'র' অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তিনজন গ্রামবাসীকে।

২০ অক্টেবর ২০০৭

মালদার মহেন্দ্রপুরে হাজারখানেক ক্ষুব্ধ মানুষ রেশন ডিলার জহর আহমেদের দোকানে চড়াও হন। তাঁরা ডিলারকে ঘিরে রেখে গত ১০ বছরে অন্ত্যোদয় যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কত পরিমাণ সামগ্রী আত্মসাৎ করেছেন তার হিসাব দিতে বলেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কোনোমতে পালিয়ে বাড়িতে ঢুকে লোহার দরজা বন্ধ করে দেয় ডিলার। শুরু হয় ভাঙচুর। উত্তেজিত জনতা দরজা ভেঙে বাড়ির ভেতর ঢোকার চেষ্টা করেন। ওই সময় ঘটনাস্থলে বিরাট পুলিশবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ : ১০ বছর আগেও ওই ডিলারের মাত্র ২ বিঘা জমি ছিল। বর্তমানে নামে-বেনামে কয়েকশো বিঘা জমি ও ১৫ কাঠা জমিতে উঁচু পাঁচিল দেওয়া প্রাসাদোপম দেতালা বাড়ি। কোথা থেকে এল এত টাকা?

২৪ অক্টোবর ২০০৭

রেশন রোষে উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিথারী পরমকাঠি এলাকা। রেশন ডিলারের বাড়িতে চড়াও হওয়া ক্ষিপ্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ছোড়া হয় টিয়ার গ্যাস। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, পুলিশ কম করে হলেও ১০/১২ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। উল্লেখ্য, ২৩ অক্টোবর রেশন ডিলারদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করার পাশাপাশি জেলায় জেলায় সিপিআইএম

নেতারা অসাধু দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারদের হয়ে পথে নামে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে জনতা। যে রেশন ডিলারকে বাঁচাতে পুলিশ গ্রামবাসীদের লাঠি পেটা করে রক্তাক্ত করে, সেই বাপ্পা মোল্লার বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, কয়েক বছর আগে খেতে পেত না, রেশনের মাল চুরি করে এখন কোটি টাকার মালিক। এরকম অসৎ ডিলারদের নিরাপত্তা দিতে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে, সিপিআইএম-এর লোকেরা তাদের বাঁচাতে অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে !

২৬ অক্টোবর ২০০৭

রেশন রোষের সরাসরি টার্গেট হয়ে উঠল বর্ধমানের ভাতার থানার ভাটাকুল গ্রামের সিপিআইএম শাখা কমিটির সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ভাটাকুল গ্রামের রেশন ডিলার অসীম গোস্বামী দীর্ঘদিন ধরে রেশনের দ্রব্য বাইরে বিক্রি করে আসছেন। এবারের বন্যাত্রাণের সামগ্রীও তিনি গ্রামবাসীদের দেন নি। এই নিয়ে গ্রামে ক্ষোভ জমছিল। গ্রামবাসীরা জানান, বিভিন্ন জেলায় জনরোষ দেখে অসীমের আশঙ্কা ছিল, যে কোনো সময় পাবলিকের ক্ষোভ তার ওপর আছড়ে পড়বে। তাই আগে ভাগেই অসীম পার্টির দ্বারস্থ হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জনরোষ ও ক্ষতিপূরণের হাত থেকে তাকে বাঁচাবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাকার সাত সিপিআইএম নেতা অসীমের সঙ্গে ১৪ লাখ টাকার রফা করেছে। এরপরেই গ্রামবাসীরা ওই সাত নেতাকে খুঁজতে শুরু করেন। ২৬ অক্টোবর তিন নেতার বাড়ি ঘেরাও করা হয়। দু-জন পালিয়ে যায়। সুকুমার মণ্ডলকে ধরে ফেলে জনতা। তারপর ওই দাপুটে নেতাকে ধাক্কা মারতে মারতে গ্রামের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ১০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে মুচলেকা দিতে বাধ্য করা হয়। সুকুমার লেখে, 'গ্রামের গরিব মানুষদের বঞ্চিত করে এভাবে গোপন রফা করা খুবই অন্যায়। আমি এর জন্য লজ্জিত।'

২৭ অক্টোবর ২০০৭

রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার জন্য দোষ স্বীকার বা আত্মশুদ্ধির প্রতিশ্রুতি নয়, বরং যাঁরা দুর্নীতি ধরে ফেলছেন, তাঁদের সন্ত্রস্ত করতে, গত ২৬ অক্টোবর মারাত্মক অস্ত্র সহ (লাঠি, বল্লম, রামদা, কাটারি, টাঙ্গি, এমনকী দেশি-বন্দুক),'রেশন ডিলার ও সিপিআইএম নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে' একটি মিছিল বেরোয় হুগলির মঙ্গলকোটে। মিছিল থেকে গ্রামবাসীদের সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়। এ-ব্যাপারে এক নেতার বয়ান : কিছু বানর লম্ফঝম্ফ করছে। তাদের মাঝে মাঝে হুড়কো দেখাতে হয়।

ঋণস্বীকার : *আনন্দবাজার পত্রিকা* ।

প রি শি ষ্ট : ৩

গণবণ্টন ব্যবস্থা ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রী

পরিসখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অরগানাইজেশনের (NSSO) জাতীয় সমীক্ষা-র ৬১তম পর্যায়ের গৃহস্থ ভোক্তা ব্যয়ের হিসাবের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি 'Public Distribution System and Other Sources of Household Consumption, 2004-05'-এর অন্যতম এই সমীক্ষা রিপোর্টটি। গণবণ্টন ব্যবস্থায় গ্রহীতারা যে পরিমাণ চাল, গম/আটা, চিনি ও কেরোসিন পান, বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সংগ্রহের উৎস, বাছাই করা চারটি খাদ্যসামগ্রীতে সরকারি পরিকল্পনার (Scheme) সহায়তা এবং ভোক্তা কী ধরনের রেশন কার্ডের অধিকারী ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে এবং ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের আলাদা আলাদা তথ্য সংগ্রহ করে এই প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে। নাগাল্যান্ড, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ও কাশ্মীরের লাদাখ ও কার্গিল জেলা ছাড়া সমগ্র ভারতেই এই সমীক্ষা চালানো হয়। ৭,৯৯৯ টি গ্রামীণ ব্লকের ৭৯,২৯৪টি পরিবার এবং ৪,৬০২টি নগর কেন্দ্রিক ব্লকের ৪৫,৩৪৬ টি পরিবারকে এই সমীক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য

৮১ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার এবং ৬৭ শতাংশ শহুরে পরিবারের রেশনকার্ড আছে। দারিদ্র সীমার নীচের (BPL) কার্ডের ক্ষেত্রে ২৬.৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার ও ১০.৫ শতাংশ শহুরে পরিবার এবং শহরে ২ শতাংশ কম পরিবারে অন্ত্যোদয় কার্ড আছে।

গ্রামে ১৮.৭ শতাংশ পরিবার ও শহরের ৩৩.১ শতাংশ পরিবারের কোনো ধরনের কার্ডই নেই।

গ্রামে মাথাপিছু মাসিক ব্যয়ের (MPCE) ভিত্তিতে নির্ধারিত সব থেকে নীচে থাকা পরিবারগুলির মধ্যে ৪১শতাংশ পরিবারের বিপিএল কার্ড আছে। অন্যদিকে গ্রামীণ জনসংখার উচুঁতলার ৫ শতাংশ পরিবারের মধ্যে শতকরা ১১ ভাগ পরিবারের বিপিএল রেশন কার্ড আছে। তার পরের ধাপের ৫ শতাংশের মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ পরিবারে এবং তৃতীয় ধাপে ১০ শতাংশ পরিবারের মধ্যে ১৮ শতাংশের বিপিএল রেশন কার্ড আছে।

শহরের দরিদ্র মাথাপিছু মাসিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে নীচে থাকা শ্রেণির পরিবারের ক্ষেত্রে মাত্র ২৯ শতাংশ পরিবারে বিপিএল রেশন কার্ড আছে।

গ্রামে যতগুলি পরিবারে রেশন কার্ড আছে তার মধ্যে ১০ শতাংশ পরিবার তফসিলি উপজাতি ও ২২ শতাংশ পরিবার তফসিলি জাতিভুক্ত। ৪২ শতাংশ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (OBC), এবং ২৬ শতাংশ অন্যান্য (সাধারণ) পরিবার।

শহরের ক্ষেত্রে, রেশন কার্ডের অধিকারী পরিবারগুলির ২ শতাংশ তফসিলি উপজাতি, ১৬ শতাংশ তফসিলি জাতি, ৩৫ শতাংশ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং ৪৭ শতাংশ অন্যান্য পরিবার।

কৃষিশ্রমিক পরিবারগুলির ৪৩ শতাংশ এবং অন্যান্য শ্রমিকের ৩২ শতাংশ পরিবারে বিপিএল কার্ড আছে।

০.০১ হেক্টরেরও কম জমি থাকা পরিবারগুলির ৫১ শতাংশ পরিবারে কোনো রেশন কার্ড নেই। অন্যদিকে এর থেকে বেশি জমি থাকা পরিবাগুলির ৭৭-৮৬ শতাংশ পরিবারে কোনো-না-কোনো ধরণের রেশন কার্ড আছে।

গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) থেকে প্রাপ্ত চালের ব্যবহার সব থেকে বেশি তামিলনাড়ুতে, তারপরে যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও কেরালার স্থান।

গণবণ্টন ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত গমের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে কর্ণাটক, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চল, এবং মধ্যপ্রদেশ।

গণবণ্টন ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত চিনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শীর্ষে তামিলনাড়ু। তারপরেই আসাম ও অন্ধ্রপ্রদেশ।

গণবণ্টন ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত চিনি ব্যবহার করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের ২ শতাংশেরও কম মানুষ।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ছাড়া অন্যান্য সব প্রধান রাজ্যগুলিতে গণবণ্টন ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত কেরোসিন ব্যবহারের পরিমাণ ৫৫ শতাংশ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান শীর্ষে। গ্রামে ৯১ শতাংশ পরিবার, শহরে ৬০ শতাংশ পরিবার।

২০০৪-০৫ সালে ভারতের গ্রামাঞ্চলে মিড-ডে-মিল স্কিম ২২.৮ শতাংশ পরিবারের শিশুদের, নিবিড় শিশু বিকাশ প্রকল্প (ICDS) ৫.৭ শতাংশ পরিবারকে, কাজের-জন্য-খাদ্য প্রকল্প ২.৭ শতাংশ পরিবারকে এবং অন্নপূর্ণা স্কিম মাত্র ০.৯ শতাংশ পরিবারকে সহায়তা দিয়েছে।

শহরে এবং গ্রামে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে তফসিলি উপজাতি কাজের জন্য খাদ্য এবং নিবিড় শিশু বিকাশ প্রকল্প থেকে সব থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে।

ভারতের প্রধান রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন ধরণের রেশন কার্ডের উপভোক্তাদের শতকরা হিসেবটি এখানে সংযোজিত হলো।

ভারতে গণবণ্টন ব্যবস্থায় পরিবেশিত রেশন কার্ডের ধরণ (শতাংশে) (গ্রাম)

রাজ্য	অন্ত্যোদয়	বিপিএল	অন্যান্য	কোনো কার্ড নেই
অন্ধ্রপ্রদেশ	২.৮	৫৪	১৬	২৮
আসাম	০.৬	১২	৬৩	২৫
বিহার	২.৩	১৫	৬০	২৩
ছত্তীসগঢ়	৪.৪	৩৫	৩২	২৯
গুজরাট	০.৮	৩৬	৬৮	১৩
ঝাড়খণ্ড	৩.০	২৩	৫১	২৩
কর্ণাটক	৯.৬	৪২	২৬	২৩
কেরালা	১.৮	২৮	৫৭	১৩
মধ্যপ্রদেশ	৩.৩	৩১	৩৮	২৮
মহারাষ্ট্র	৪.৪	৩১	৪৬	১৯
ওড়িশা	২.০	৪২	২৩	৩৩
পাঞ্জাব	০.১	১২	৭৬	১২
রাজস্থান	২.৮	১৬	৭৮	৪
তামিলনাড়ু	১.৫	১৯	৬৯	১১
উত্তরপ্রদেশ	২.৮	১৪	৬৫	১৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩.২	২৭	৬১	৮
ভারত	২.৯	২৬.৫	৫১.৮	১৮.৭
		(শহর)		
অন্ধ্রপ্রদেশ	১.৬	২৬.৬	১৮	৫৪
আসাম	০.২	৩.২	৪০	৫৬
বিহার	০.৮	৪.৭	৪২	৫২
ছত্তীসগঢ়	২.১	১৫.২	৪০	৪৩
গুজরাট	০.১	৮.৪	৬৭	২৪
ঝাড়খণ্ড	০.৮	৭.৫	৩৩	৫৮
কর্ণাটক	২.০	১৪.৪	৩৩	৫১
কেরালা	০.৯	১৯.৮	৬০	১৯
মধ্যপ্রদেশ	১.৯	১২.৭	৪৩	৪৩
মহারাষ্ট্র	০.৩	৮.০	৬৭	২৫
ওড়িশা	১.৩	১১.৮	২৯	৫৮
পাঞ্জাব	০.০	৩.৯	৬৬	৩০
রাজস্থান	০.৬	২.৪	৮২	১৫
তামিলনাড়ু	০.৬	১২.৮	৬৪	২২
উত্তরপ্রদেশ	০.৭	৭.২	৫৭	৩৬
পশ্চিম বঙ্গ	০.৮	৮.৮	৭১	২০
ভারত	০.৮	১০.৫	৫৫.৬	৩৩.১

পরিশিষ্ট : ৪

খাদ্যের অধিকার : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলি

প্রকল্পের নাম : অভীষ্ট গণবণ্টন ব্যবস্থা (টি পি ডি এস)

কাদের জন্য : বিপিএল-ভুক্ত সব পরিবার।

সুযোগ-সুবিধা : প্রতিমাসে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি চাল/গম। পশ্চিমবঙ্গে ইউনিট পিছু ৭ কেজি চাল/গম। চালের মূল্য প্রতি কেজি ৬ টাকা ১৫ পয়সা। গমের মূল্য প্রতি কেজি ৪ টাকা ৬৫ পয়সা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ : খাদ্যশস্য সরবরাহ বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। রেশন দোকান নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত (কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ দিন) খোলা রাখতে হবে। একাধিকবার খেপে খেপে খাদ্যশস্য বিতরণ করতে হবে। বরাদ্দ খাদ্যশস্য খোলা বাজারে বিক্রি হলে বা যে কোনো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে অভিযুক্ত রেশন ডিলারের লাইসেন্স বাতিল হবে।

প্রকল্পের নাম : অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (এ এ ওয়াই)

কাদের জন্য : বিপিএল পরিবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গরিব ৩৮ শতাংশ পরিবার। গ্রামসংসদের সভায় এই তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা : পরিবার পিছু প্রতিমাসে ৩৫ কেজি চাল/গম। পশ্চিমবঙ্গে ইউনিট পিছু ৭ কেজি চাল/গম। চালের মূল্য প্রতি কেজি ৩ টাকা। গমের মূল্য প্রতি কেজি ২ টাকা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ : অক্ষম, অশক্ত, অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী, শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল, ৬০ বছরের উর্ধ্বে সহায়-সম্বলহীন সকলকে এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লোধা-শবর, টোটো ও বিরহোর জনজাতির সব পরিবারেকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: অন্নপূর্ণা প্রকল্প (এ এস)

কাদের জন্য : বি পি এল পরিবারের ৬৫ বছরের উর্ধ্বে সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ/বৃদ্ধা যারা বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার উপযোগী অথচ এই ভাতা পাচ্ছেন না।

সুযোগ সুবিধা : প্রতি মাসে ১০ কেজি চাল/গম বিনামূল্যে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ : জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য অথচ বঞ্চিত সকলকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: দুপুরের আহার (মিড ডে মিল)

কাদের জন্য : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের (৬-১১ বছর বয়স পর্যন্ত) জন্য।

সুযোগ সুবিধা : দৈনিক ১০০ গ্রাম চাল এবং ২ টাকা ডাল, সবজি, মাছ ইত্যাদি খরচের জন্য।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ : ৮-১২ গ্রাম প্রোটিনযুক্ত ৩০০ ক্যালোরি খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ রান্না করা খাবার বছরে অন্তত ২০০ দিন দিতে হবে। দুর্নীতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রকল্পের নাম : সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি এস)

কাদের জন্য : সমস্ত শিশু (৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত) কিশোরী ও গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য।

সুযোগ-সুবিধা : জ্বালানির খরচ ছাড়া মাথাপিছু দৈনিক ২ টাকা। চাল, ডাল, সবজি, ডিম ইত্যাদির খরচের জন্য।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ : শিশুরা ৮-১০ গ্রাম প্রোটিনযুক্ত ৩০০ ক্যালোরি খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ খাবার বছরে অন্তত ৩০০ দিন পাবে। অপুষ্টিতে ভোগা শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা এবং বয়ঃসন্ধির কিশোরীরা শিশুদের দ্বিগুণ খাবার পাবে। প্রত্যেক জনপদে তপসিলি ও আদিবাসী এলাকায় যত শীঘ্র সম্ভব একটি করে আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে থাকবে। ঠিকাদারের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করা যাবে না।

খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৬ ও রেশন বিদ্রোহ ২০০৭

২০০৪ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত প্রান্ত আমলাশোল গ্রামে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। ওই গ্রামের পাঁচজন মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিলেন। মরে গিয়েই যেন তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর বি(দ্ধে একটাও মিছিল হয় নি, মিটিং হয় নি, বন্‌ধ হয় নি। তবুও বর্ধমান থেকে পু(লিয়া, তারপর মেদিনীপুর পশ্চিম, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি, মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়ে রেশন অসন্তোষ। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কার্যত গণবিদ্রোহের চেহারা নেয়। বামফ্রন্টের শাসনে এমন বিদ্রোহ অভাবনীয়। আর অতীতে যারা রাজ্য জুড়ে 'খাদ্য আন্দোলন' পরিচালনা করেছিল, তারাই আমলাশোলের অনাহারকে বিদ্রূপ করেছে। সংবাদমাধ্যমের 'বানানো গল্প' বলে উপে(া করেছে। নগরের মানুষ চুপ থেকেছেন। কেন? তবুও এবারের রেশন রোষের গতিপ্রকৃতি, তার দ্রুত বিস্তার বারে বারেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে উনষাট আর ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের পটভূমি।

একটি না গ রি ক ম ঞ্চ প্রকাশনা